ফেব্রুয়ারি ২০২০

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৯তম সংখ্যা

মুজিববর্ষ সংখ্যা-২

তারুণ্যের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু

নিরীক্ষা

২২৯তম সংখ্যা : ফেব্রুয়ারি ২০২০ (বিশেষ সংখ্যা)

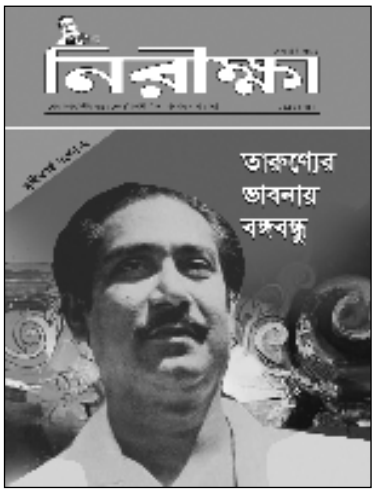

একজন রাজনৈতিক নেতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হলো মানুষকে আপন করার শক্তি। সেই শক্তিগুণে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চরম শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন, সহানুভূতি দিয়ে সংশোধনের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ছিলেন নিরহংকারী। ইতিহাস এ মানুষটিকে ভিন্নতা দিয়েছে তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। ত্যাগ, ন্যায্যতা, সততা, সহমর্মিতা, ভালোবাসার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র-সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত ছিল তাঁর। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সাধনা ছিল শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি মানবিকতা ও ভালোবাসাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষকে ভালোবাসা এবং তাদের মন জয় করা ছাড়া সামগ্রিক কল্যাণসাধন একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ।

বঙ্গবন্ধু তারুণ্যের অহংকার। তরুণসমাজে বঙ্গবন্ধু শুধু ভালোবাসার নাম নয়, তিনি একটি আদর্শ। শুধু বাংলার তরুণদের নয়, বিশ্বের তরুণসমাজের জন্যও তিনি অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। তরুণদের দীপ্ত মেধাকে কাজে লাগাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞা ও মন্ত্রই বড়ো নিয়ামক। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের নিয়ে বহু প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উজ্জীবিত করে গেছেন বাংলার তরুণসমাজকে। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, সাহসিকতা, দূরদর্শিতায় দীক্ষিত বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। আজ বাংলাদেশ যে ঈর্ষণীয় অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলছে– এর পেছনের ইতিহাস তরুণদের অসাধারণ ভূমিকা। এই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞাই অনুপ্রাণিত করেছে তরুণদের। তাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তরুণ প্রজন্ম কাঁধে নিয়েছে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো।

একটি প্রশ্ন প্রায়ই উঠে আসে– বর্তমান তরুণ-যুবকরা বঙ্গবন্ধুকে তাদের মননে কতটুকু ধারণ করেন! তাঁর চেতনা কি তারা ধারণ করেন সত্তায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তরুণদের কাছে 'তারুণ্যের চেতনায় বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে লেখা আহ্বান করে 'নিরীক্ষা'। আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কাছে লেখা পাঠিয়েছেন শতাধিক তরুণ। এসব লেখা থেকে ২৭ জনের লেখা বাছাই করে প্রকাশ করছে 'নিরীক্ষা'। লেখকরা তাদের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, সঠিক প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ্য, 'নিরীক্ষা'র মূল্যায়নের মানদণ্ডে প্রায় সবার লেখাই মানসম্পন্ন ও প্রকাশ উপযোগী। তবে বাছাই পরীক্ষায় আপাত উত্তীর্ণরাই বিজয়ী।

আমরা মনে করি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে দেশের তরুণসমাজ একই ছায়াতলে সমবেত হবে। বঙ্গবন্ধুকে উন্মুক্ত করতে হবে তাঁরই সৃষ্ট অসীমতায়। কারণ, বঙ্গবন্ধু আমাদের পরিচয়, তিনিই আমাদের অস্তিত্ব। তিনিই আমাদের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। তরুণসমাজকে এই মুজিববর্ষে শপথ নিতে হবে দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। যেখানে থাকবে না সাম্প্রদায়িকতা। ঘটবে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, গড়ে উঠবে বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা। অব্যাহত থাকবে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন। যে দীক্ষা বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন। জয় বাংলা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

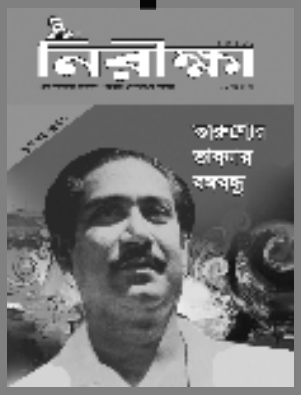

তারুণ্যের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ৩
অমিত বণিক

তরুণ মুজিবের নয়াচীন দর্শন ৫
রেজা এনায়েত

যে পাইপ আজও জ্বলছে তারুণ্যের হৃদয়ে... ১০
সারতাজ আলীম

তারুণ্যের আঁতুরঘর বঙ্গবন্ধু ১২
এমএসবি নাজনীন লাকী

বঙ্গবন্ধু বাঙালির আদর্শিক ফিলোসফি ও প্রেরণা ১৪
হায়দার মোহাম্মদ জিতু

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু ১৭
মোয়াজ্জেম হোসেন

চেতনায় বঙ্গবন্ধু ২০
কামাল হোসাইন

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ২২
মিহির কান্তি ঘোষাল

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ ২৪
তাপস হালদার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ২৬
মো. নূর ইসলাম খান অসি

বঙ্গবন্ধু, ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষা ২৯
শরিফুল হাসান শিশির

৭ মার্চের ভাষণ: বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মহাকাব্য ৩১
মো. আজিজুল ইসলাম

তৃতীয় বিশ্ব উত্তরণে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ৩৪
শাহ্ সোহাগ ফকির

আপসহীন বঙ্গবন্ধু ৩৬
সোহেল রানা

চেতনায় যা ধারণ করতে হবে ৩৮
রাশেদ রাব্বি

সংগীত অনুরাগী বঙ্গবন্ধু ৪০
বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, দূরদর্শী নেতৃত্ব ৪৩
অনয় মুখার্জী

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সমবায় ৪৬
এসএম মুকুল

বঙ্গবন্ধুর আত্মদর্শন ও পর্যালোচনা ৪৯
রফিকুল ইসলাম পিন্টু

অনন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বঙ্গবন্ধু ৫১
রফিক আহমদ খান

নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন সময়ের দাবি ৫৪
এসএম ইমরান হোসেন

তরুণ প্রজন্ম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৫৭
তালহা তানজিল সজিব

অসমাপ্ত আত্মজীবনী: বঙ্গবন্ধুর খোঁজে ৫৯
সুমিত বণিক

বঙ্গবন্ধু এবং 'কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন নয়'-এর দর্শন ৬১
শিশির রেজা

শতবর্ষে মুজিব ৬৪
এলমা ওয়াজেদ

অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু ৬৯
পপি দেবী থাপা

স্বাধীনতার স্বপ্নসারথি ৭৩
মো. মিনহাজ উদ্দীন

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

তারুণ্যের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

অমিত বণিক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি নিজের জীবনকে নানাভাবে সাজিয়েছিলেন এবং হাসিমুখে জীবনটা বাঙালি জাতিকে দানও করে গেছেন। আমাদের চারপাশে তাকালে দেখব কেউ অর্থের পেছনে, কেউ সাফল্যের পেছনে, কেউ বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ির পেছনে, কেউ বা শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে ছুটে হয়রান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এসবের কোনোটার পেছনে কোনোদিন ছোটেননি। তিনি ছুটেছেন বাঙালির অধিকার আদায়ের পেছনে, বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের পেছনে। তাঁর সব চিন্তা ও কর্মের মূলে ছিল বাংলার মানুষের মুক্তির উপায়। তাই তো তিনি বাঙালি জাতির পিতা, বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে জায়গা পেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। তিনি এক বক্তব্যে দেশব্যাপী ঘুসখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারিদের দৌরাত্ম্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত এদের আমি অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, হুমকি দিয়েছি। চোরে নাহি শুনে ধর্মের কাহিনি। কিন্তু আর না। বাংলার মানুষের জন্য জীবনের যৌবন আমি কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছি। এ মানুষের দুঃখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।' বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিরাজগঞ্জে এক জনসভায় বলেন, 'শাসনতন্ত্রে লিখে দিয়েছি যে কোনোদিন আর শোষকেরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ। দ্বিতীয় কথা, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে, এর মধ্যে কারও কোনো হাত থাকা উচিত নয়। তৃতীয়, আমি বাঙালি। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই সম্মানের সঙ্গে। চতুর্থ, আমার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্মকর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্মকর্ম পালন

করবে, বুদ্ধিস্ট তার ধর্মকর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। তবে একটা কথা হলো– এই ধর্মের নামে আর ব্যবসা করা যাবে না।' বঙ্গবন্ধুর লেখা দুটি বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' আর 'কারাগারের রোজনামচা' আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হোক, যাতে কিশোর-যুবকরা তাঁর মতাদর্শ পড়ে নিজেদের জীবন সাজাতে পারে।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, 'আত্মসমালোচনা করতে, দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা করো। মনে রেখো, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম করো আর আত্মশুদ্ধি করো। তাহলেই দেশের মঙ্গল করতে পারবা।'

আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আজকে এই যে নতুন এবং পুরান যে সমস্ত সিস্টেমে আমাদের দেশ চলছে, আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন আছে। আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম, আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখব না, সেজন্য আমি সবই ভুল করলে আর সকলেই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেশতা নই, শয়তানও নই, আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না আমি যেটা করেছি, সেটাই ভালো। দ্যাট ক্যান নট বি হিউম্যান বিং।'

১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দেওয়া ভাষণে তিনি দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, 'এখনো কিছুসংখ্যক লোক, এত রক্ত যাওয়ার পরেও যে সম্পদ আমি ভিক্ষা করে আনি, বাংলার গরিবকে দিয়ে পাঠাই, তার থেকে কিছু অংশ চুরি করে খায়। এদের জিহ্বা যে কত বড়ো, সে কথা কল্পনা করতে আমি শিহরিত হয়ে উঠি। এই চোরের দল বাংলার মাটিতে খতম না হলে কিছুই করা যাবে না। আমি যা আনব, এই চোরের দল খেয়ে শেষ করে দেবে। এই চোরের দলকে বাংলার মাটিতে শেষ করতে হবে।'

গণতন্ত্র, বিরোধী দল, বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'দেশে কোর্ট-কাচারি আছে, আছে প্রচলিত আইন এবং কাউকে শাস্তি দিতে হলে যথাযোগ্য বিচারের মাধ্যমে সেটা দিতে হবে। আমরা জানি যে, বিগত সাত বছর এই পবিত্র সংসদের অনেক সদস্যকে বিনা বিচারে জেলে নেওয়া হয়েছে। একজন মাননীয় সদস্য পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, তাকে পাকিস্তানের স্বার্থে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।' পাকিস্তান গণপরিষদের করাচি অধিবেশনে ইসলামিক রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সম-অধিকার বিষয়ে আলোচনায় বলেন, 'আমাদের টেলিফোন টেপ করা হয় এবং চিঠিগুলো পুনরায় সেন্সর করা হয়। আপনারা বলে থাকেন যে বাক্‌স্বাধীনতা মানেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। আপনি কি জানেন, পূর্ববঙ্গে সম্পাদকদের ডেকে বলা হয় আপনারা এটা ছাপাতে পারবেন না; আপনারা ওটা ছাপতে পারবেন না। স্যার, তাঁরা সত্য কথা পর্যন্ত লিখতে পারেন না এবং আমি সেটা প্রমাণ করে দিতে পারি। পূর্ব বাংলা সরকার লিখুক আর একজন কেরানি লিখুক, সেটা বড়ো কথা নয়। নির্দেশটা যায় সচিবালয় থেকে যে আপনি বিষয়গুলো সম্পর্কে লিখতে পারবেন না। সরকারের তরফ থেকে একজন ইন্সপেক্টর গিয়ে নির্দেশনা দেন যে আপনি একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে লিখতে পারবেন না।'

বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন তিনি দেশের মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না

বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু যেন একই সূত্রে গাঁথা। এরা কেউ কারও থেকে আলাদা নয়। বঙ্গবন্ধু আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের ধ্যানধারণায় প্রভাবিত হয়ে বাঙালির মুক্তির জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বাঙালিকে, বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই ভালোবাসাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যখন দেশকে সবদিক থেকে উন্নত করার কাজে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একদল বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষের দল হত্যা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের সবাইকে। বাংলার আকাশে যেন নেমে এসেছিল কালো আঁধার। সেই কালো আঁধার এখনো কাটেনি। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন তিনি দেশের মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না। তাঁর এ অসম্পন্ন কাজটি দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুচারুভাবে করে যাচ্ছেন। যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলার মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেভাবে সবাই মিলে এগিয়ে এলেই সব বাধা পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব বলে মনে করি।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, ঢাকা

তরুণ মুজিবের নয়াচীন দর্শন

রেজা এনায়েত

প্রবাদ আছে, 'যে নৌকা ভৈরব যায়, তার পাল দেখলেও চেনা যায়।' কৈশোর-তারুণ্যের উচ্ছল সময়েই সবার চোখে নায়কের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু হয়ে, বাংলাদেশের পত্তন করে, জাতির পিতা হিসেবে জাতিকে মুক্তির সোপানে পৌঁছে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি আরোপিত সম্মানের যথার্থতা প্রমাণ করেছিলেন। হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের মহানায়ক। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে তাদের ভালোবাসার ঋণ শোধ করে গিয়েছেন।

কবি জাফর ওয়াজেদ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু ছিলেন সময়ের চেয়ে প্রাগ্রসর, এমনকি তাঁর দল আওয়ামী লীগ থেকে অনেক বছর এগিয়ে।' শেখ মুজিব ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান কায়েমের জন্য জীবন বাজি রেখেছেন। শেখ মুজিব তরুণ বয়সে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে মানুষের মুক্তি মিলবেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধের প্রভাবে দুর্ভিক্ষজনিত কারণে ৪০ লাখ বাঙালির মৃত্যু তরুণ শেখ মুজিবের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি তখন রিলিফ কমিটিতে কাজ করেছেন। "দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। ... বাংলাদেশের এই দুরবস্থা দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর আর মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে।

ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান)

তরুণ মুজিব গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দেখেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভয়াবহ রক্তপাত দেখেছেন। জীবন বাজি রেখে সক্রিয় ছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকাতে, রক্তের হোলিখেলার মধ্যে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটেছেন আর্তদের সেবায়, বিপদগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য। এসবই তরুণ শেখ মুজিবের চেতনায় যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তৈরি করেছিল। নয়াচীন 'পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিয়ন্স' আয়োজন করে পাকিস্তান শান্তি পরিষদকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিনিধিদলে পূর্ব বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান শান্তি কমিটি। সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু সদ্যকারামুক্ত হয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে জনমত গঠন করতে পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষ করেছেন। যুদ্ধবিরোধী চেতনা, আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনুরোধ, বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিজের অবদান রাখার সুযোগ– বঙ্গবন্ধুকে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে উৎসাহ জোগায়। তাছাড়া নয়াচীন অল্পদিনের মধ্যে কতটা উন্নতি করেছে, সেটা দেখার বাসনাও বঙ্গবন্ধুর ছিল। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর কমিউনিস্ট-ভীতি তখন তুঙ্গে। তাই চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা শুরু হলো। মুসলিম লীগ নেতারা কমিউনিস্ট বলে আগে থেকেই গালি দিত। এবার কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্ট নয়াচীনের সম্মেলনে যেতে চাওয়ার সমালোচনায় বঙ্গবন্ধু স্বগতোক্তি করেন– "কথাটা সত্য যে আমরা কমিউনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, 'আমরা শান্তি চাই'।"

শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার মনস্থির করলেই যাওয়া সহজ নয়। সবার আগে দরকার পাসপোর্ট। কিন্তু পাসপোর্ট পাওয়া নিয়ে সংকটে পড়লেন বঙ্গবন্ধু। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে সবুজ সংকেত না এলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। পাসপোর্ট না থাকলে বিমান কোম্পানি বিওসি বিমানে সিটও রিজার্ভ করবে না, টিকিটও ইস্যু করবে না। অনেক ঝক্কির পর শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট পাওয়া গেল। কিন্তু টাকাপয়সা কিছু লাগবে। টাকা নেই। 'টাকার প্রয়োজন, আমরা তো বড়লোক নই। আর পাকিস্তানে ফটকা ব্যবসা করতেও আসি নাই যে নগদ টাকা থাকবে।' কোনো মতে সে ব্যবস্থাও হলো। এখানে আমরা দেখি, তিনি সরল অন্তরে অকপটে তাঁর নিজের এবং সফরসঙ্গীদের আর্থিক দৈন্যের চিত্র এঁকেছেন। এই চিত্র আমরা সামনে আরও দেখব।

তখন দূর প্রাচ্যের পথে একমাত্র ব্রিটিশ ওভারসিস এয়ারওয়েজ করপোরেশন বিমানসেবা দিত। সেবার হংকং যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে প্রায় ২০ ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। বঙ্গবন্ধু খুশি হলেন যাত্রাবিরতি পেয়ে। আতাউর রহমান খানের আত্মীয় আজমল খাঁ রেঙ্গুনে ব্যবসা করতেন। তিনি রেঙ্গুন ঘুরিয়ে দেখালেন। ব্রহ্মদেশের হাল-অবস্থা জানলেন। ব্রহ্মদেশে কমিউনিস্টদের কার্যক্রম নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'কমিউনিস্টদের জনসমর্থন তত নাই। কারণ, তারা মাঝে মাঝে রেঙ্গুন শহরের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যাকে-তাকে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করে, আর যে অঞ্চল তাদের অধিকারে যায় সেই অঞ্চলের জনগণের কাছ থেকে অর্থ ও খাদ্য আদায় করে।' পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, 'জনসমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না।' অর্থাৎ রাজনীতিতে জনসমর্থনের গুরুত্ব তিনি তখনই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

আবার রেঙ্গুনে তাঁর চোখ এড়ায়নি ব্রহ্মদেশে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের বিলাসবহুল জীবনযাপন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ তুলে ধরেছেন এভাবে, 'রাষ্ট্রদূত অনেক জাঁকজমকের সাথেই থাকেন, বিরাট অফিস ও বহু কর্মচারী তাকে সাহায্য করে। দেখে মনে হলো, যাদের টাকা দিয়া এত জাঁকজমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলেই ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তারা কেউ না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তাদের সামনে ছেলেমেয়েরা না খেয়ে তিলে তিলে মারা যায়। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। জানি না খোদার কাছে সে ফরিয়াদ পৌঁছে কি না!' তাঁর এই মন্তব্য আমাদের সামনে এমন এক রাষ্ট্রের চিত্র উন্মোচন করে, সাধারণ মানুষ যেখানে উপেক্ষিত আর মুষ্টিমেয়র স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে।

থাইল্যান্ডের ব্যাংকক হয়ে হংকং পৌঁছান। সেখানে একদিন ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যেখানে গিয়েছেন, নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনেই বিচার করেছেন সবকিছু। তাঁর যাপিত সময় ও কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞা, উদারনৈতিক জীবনদর্শন, মানবতাবাদী রাজনৈতিক দর্শন। যেনতেন কথা দিয়ে কিংবা ভাবপ্রবণ কথা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিভ্রান্ত করা যেত না। সিঙ্গু থেকে হংকংয়ে প্রবাসী এক দোকানদারের ছেলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়। আলাপ-আলোচনায় যখন জানতে পারলেন বঙ্গবন্ধু কমিউনিস্ট নন, তাঁর দলের নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে, ম্যানিফেস্টো আছে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে; তখন মন খুলে কথা বলে শুরু করলেন। তিনি ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী। তিনি তাঁর কাছে নয়াচীন সম্পর্কে আজগুবি গল্প শুরু করলেন। বিশেষ করে এ কথা বললেন যে, 'নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে অনেকের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, অনেক ফাঁসি দিয়েছে, অনেককে গুলি করে হত্যা করেছে। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে হংকংয়ে পালিয়ে এসেছে। আজ তাদের দুর্দশার সীমা নাই।' বঙ্গবন্ধুর হিসাবি মূল্যায়ন– বুঝলাম লোকটা ভাবপ্রবণ।

লোকটি বঙ্গবন্ধুকে নয়াচীন সম্পর্কে আরও সতর্ক করলেন, যারা নয়াচীন যায়, যাওয়ার সময় একরকম থাকে আর ফিরে আসার সময় আরেক রকম হয়ে যায়। ওখান থেকে ফিরে যখন আসে, তখন নয়াচীন সরকার ও জনসাধারণের খুব প্রশংসা করে। কারণ, ওখানে যারা যায়, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা তাদের মুগ্ধ করে রাখে। কিছু দেখতে দেয় না। এত বেশি আদর করে যে, দুনিয়া ভুলে যায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ, 'আমি ভাবলাম লোকটা অন্ধ। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের লোভ মোহ দিয়া ভোলানো সোজা না। তাহলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগওয়ালারা তা পারত। মনে মনে ভাবলাম, জেলে দিয়া, মিথ্যা মামলার আসামি বানিয়ে, ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত করে নানা প্রকার অত্যাচার করেও আমাদের মতের পরিবর্তন করা যায় নাই।'

বিপ্লবের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়টি চীন ভ্রমণের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর মাথায় ছিল। প্রচলিত যে ধারণা অর্থাৎ বিপ্লবের পর দেশের পরাজিত শক্তিকে কচুকাটা করতে হবে, প্রশাসন থেকে, দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর মতে, এটা সৎ আদর্শের পরিপন্থি। চীনের চিয়াং কাইশেকের সাধারণ জনগণ এবং প্রতিপক্ষের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ইতিহাসে কুখ্যাত। লাল বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পর চিয়াং কাইশেকের বাহিনী পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিল জনগণের ওপর যারা নির্যাতন করত, সেসব নেতাকর্মীরা। পালিয়ে গিয়েছিল প্রশাসনের ঘুসখোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, লুটেরা

ব্যবসায়ীরা। যারা ধরা পড়েছিল, তারা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু লাল বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের পর সাধারণ জনগণের ওপর যেমন নির্যাতন হয়নি, তেমনি প্রশাসনের সৎ কর্মকর্তাদের কিছুই হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নয়াচীনের কমিউনিস্ট সরকারের এই দিকটি ভালো লেগেছে। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টির ছাপ তাঁর সিদ্ধান্তে আমরা দেখতে পাই। তিনি গুজবে বিশ্বাস করার মতো মানুষ ছিলেন না। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন লাল বাহিনী জনসাধারণের ওপর সত্যিই নির্যাতন করেছে কি না।

"ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমার টেবিলে বসেছিল (ডিনারে)। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাল চীন বাহিনী যখন ক্যান্টন অধিকার করে, তখন অবস্থা কী ছিল, বিশেষ করে জনসাধারণের মনোভাব কী ছিল? শহরের বা শিল্পের কোনো ক্ষতি করে গিয়েছে কি না? বিশেষ করে যখন চিয়াং কাইশেক সৈন্য লইয়া পশ্চাদপসরণ করেন? ছাত্রটি ইংরেজি জানে। সে বললো, চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনী কোনো জিনিসই নষ্ট করে যায় নাই। অনেক বড়লোক এবং বড় কর্মচারী, তাহার সাথে পালাইয়া গিয়াছে। যে যাহা পারে নিয়ে গিয়াছে, আর অন্য সকল জিনিসপত্র রেখে গিয়াছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনী যখন শহরে এলো, আমরা ৫/৭ দিন ভয়েতে দরজা খুলি নাই। ভাবতাম বুঝি অত্যাচার করবে, কারণ অনেক অত্যাচারের কাহিনি আমরা শুনেছি। কিন্তু দেখলাম এরা এসেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা শুরু করলো। একদল চিৎকার করে বলতে বলতে গেল, 'তোমরা নির্ভয়ে কাজ কর্ম করো, দোকান খোলো, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাও। ঘরের বাহির হও। কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবাই আমাদের কাজ।' আস্তে আস্তে দোকান খোলা শুরু হলো, লোক রাস্তায় বেরুতে লাগলো।"

চীন শান্তি সম্মেলন আয়োজন করেছিল বিশ্বের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে। ৩৭ দেশ, ৩৭ জন পর্যবেক্ষক, ২৫টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ৩৬৭ জন ডেলিগেট নিয়ে এক মহাযজ্ঞ। আয়োজনে সামান্য বিচ্যুতি নেই। চীনের প্রতিটি প্রান্তে প্রস্তুত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী। অতিথিদের থাকতে দেওয়ার আবাসন সংকটের কথা মাথায় রেখে ৭০ দিনে জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমে বিরাট চারতলা দালান তৈরি করে তাদের সক্ষমতা, কর্মস্পৃহা ও জনগণের রাষ্ট্রকে সহায়তার স্বতঃস্ফূর্ততা প্রদর্শন করেছিল।

শান্তি সম্মেলন শুরু হলো অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ম্যাডাম সান ইয়াৎ সেনের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। ম্যাডাম সান ইয়াৎ সেন অভ্যর্থনা জানিয়ে আয়োজনের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 'ম্যাডাম (সান ইয়াৎ সেন) আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি জানালেন আমরা শান্তি চাই। বহু ঝড়ঝাপটা আমাদের দেশের ওপর দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা গেছে। সোনার দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আরও বললেন যে, আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি নাই, সেজন্য ক্ষমা করবেন।' আয়োজনের পরিপূর্ণতা, পরম আতিথেয়তার পরও ম্যাডামের বিনয়ে বঙ্গবন্ধু বিস্মিত হয়ে রসিক মন্তব্য করলেন, "আমি ভাবলাম, এত যত্ন যদি 'কিছু' না হয়, তবে আবার কী?"

> তরুণ মুজিব গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দেখেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভয়াবহ রক্তপাত দেখেছেন। জীবন বাজি রেখে সক্রিয় ছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকাতে

নয়াচীনের ঊর্ধ্বতন সব নেতাই ইংরেজি ভাষা জানার পরও চীনা ভাষায় বক্তৃতা করেন। মাতৃভাষার প্রতি প্রেম তাদের কঠিন। বঙ্গবন্ধুর মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ছিল অতুলনীয়। শুধু বাংলা ভাষাকে বিদেশের মাটিতে সম্মান জানানোর জন্যই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। 'আমাদের সভা চললো, বক্তৃতা আর শেষ হয় না। এত বক্তৃতা দেওয়ার একটা কারণ ছিল। প্রত্যেক দিন সভায় যে আলোচনা হয় এবং যারা বক্তৃতা করেন তাদের ফটো দিয়ে বুলেটিন বাহির হয়। এই লোভটা অনেকেই সংবরণ করতে পারেন নাই। আর আমার বক্তৃতা দেওয়া ছিল এই জন্য যে, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিব।'

১ অক্টোবর চীনের স্বাধীনতা দিবস। শান্তি সম্মেলন শুরুর ঠিক একদিন আগে সব অতিথিকে

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই দিনটি চীনাদের কাছে পবিত্র। সবাই যথাসাধ্য সুন্দর পোশাকে রাস্তায় নেমে আসে। আনন্দ করে। সব বাড়ি, গাড়ি, দোকানে লাল পতাকা টানানো হয়। বঙ্গবন্ধু দেখলেন পুরো পিকিং যেন সেজে উঠেছে। মানুষ যেন পাগল হয়ে গেছে মাও সেতুংকে দেখার জন্য, মাওয়ের বাণী শোনার জন্য। প্রথমেই বিভিন্ন বাহিনীর প্যারেড শুরু হলো। প্যারেডের পরে শোভাযাত্রা শুরু হলো। প্রথমে মহিলা ন্যাশনাল গার্ডের শোভাযাত্রা, তারপর কৃষকদের শোভাযাত্রা, সবশেষে শিশুদের। মুহুর্মুহু গগনবিদারী স্লোগান। মনে হলো কোটি লোক হবে। পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মাও সেতুং সালাম গ্রহণ করেছেন, এক মুহূর্তের জন্য বসেননি। হাসি হাসি মুখ, কোনো ক্লান্তি নেই।

সমাবেশে লোকের সংখ্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও সতীর্থদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। একেকজন একেক রকম সংখ্যা বলছিল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরের দিনের পত্রিকা দেখার সিদ্ধান্ত হয়। তবে সন্দেহ ছিল পত্রিকার ওপর, কত বাড়িয়ে লেখে।

'আমাদের মাঝে আলোচনা শুরু হলো কত লোক হবে। কেউ বলে ৫০ লক্ষ, কেহ বলে ৪০ লক্ষ, কেহ বলে এক কোটি। ৪০ লক্ষের কম কেউ বললো না। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, ৩০ লক্ষ তো হবেই। আমি কিন্তু ১৫ লক্ষ বললাম। সকলেই আমার ওপরে ক্ষেপে উঠল। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, আপনার ধারণাই নাই। কী করবো! শেষ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করেছে বলে ধরে নেওয়া গেল। ... যাহা হোক, কাল সকালে দেখা যাবে– খবরের কাগজে কত লেখা হয়! আমাদের দেশের অভ্যাস, সরকারি কাগজে যদি এক লক্ষ লেখা হয় তবে আমরা ধরে নিব ২৫ হাজার। কারণ, তাঁর বেশি তো হবেই না। ওটা আমাদের দেশের কাগজআলারা লেখেই থাকে। আমাদের দেশের সরকারি প্রেসনোটেই মাঝে মাঝে লেখে। আর কাগজআলারা কেন লেখবে না? ভাবলাম, এদেশে সরকারি কাগজগুলিও বোধহয় একই রকম। আর কমিউনিস্টরা তো একটু বাড়াবাড়ি করেই থাকে। পাঁচ হলে পঞ্চাশ করা তাদের অভ্যাস!

সকালে উঠে দেখি, হায় হায়! কমিউনিস্ট দেশের সরকারি কাগজ সত্য কথা লেখে! একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লিখেছে ৫ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। কোথায় আমরা বলি ২৫ লক্ষ! আর সরকারি কাগজ লেখে পাঁচ লক্ষ। আশ্চর্য হলাম। মিছাই কি এদেশের জনসাধারণ সরকারকে ভালোবাসে?'

বিষয়টি উল্লেখ করা এই জন্য যে, তাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছিল জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং মিথ্যা বলে তাদের আস্থা-সমর্থন-ভালোবাসা অর্জন করা যায় না। সারাজীবন তিনি এ বিশ্বাস বয়ে বেড়িয়েছেন। কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেননি। পরিস্থিতি যা-ই হোক, সাহসের সঙ্গে প্রসারিত বক্ষে তিনি তাঁর দেশের মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছেন, সত্যকে মোকাবিলা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শান্তি সম্মেলনের সমপরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন নয়াচীনের নয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থা জানতে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যই হওয়া উচিত মানুষের অধিকার, মানুষের মুক্তি, মানুষের সুন্দর জীবন। বঙ্গবন্ধু কৃষক-শ্রমিকদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। নতুন-পুরোনো বেশকিছু কারখানা পরিদর্শন করেছেন। শ্রমিক কলোনিতে গিয়েছেন, তাদের আবাসন ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা দেখেছেন।

একটি বিষয় তাঁকে খুব টেনেছিল। নয়াচীন সব কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করেছে তা নয়। অনেক কলকারখানাই ব্যক্তিমালিকানায় রেখে দিয়েছে। যেসব মিল জাতীয়করণ করা হয়নি, সেগুলোতেও ইচ্ছেমতো লাভ করার সুযোগ নেই। আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারকে দাখিল করতে হয়। শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচের পর যা থাকে, সেখান থেকে একটা অংশ নিতে পারে মালিক। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও মালিকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সব ঠিক হয়।

'আমরা দেখে আনন্দিত হলাম, মেয়ে শ্রমিকরা যখন কাজে যায় তখন তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য মিলের সাথে নার্সিং হোম আছে। কাজে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের সেখানে দিয়ে যায় আর বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যায়। যে সমস্ত শ্রমিক বিবাহ করে নাই তাদের জন্য বিরাট বিরাট বাড়ি আছে। সেখানে আমাদের দেশের ছাত্ররা যেমন এক রুমে তিন চারজন থাকে, তেমনি অবিবাহিত যুবকরাও থাকে। যুবতীদের জন্যও একই রকম ব্যবস্থা আছে।'

নয়াচীনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার মানও অনন্য। রাষ্ট্রের খরচ করতে হয় না, কারখানা কর্তৃপক্ষই খরচ দেয়। 'শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে। অসুস্থতার সময় বেতনসহ ছুটি দেওয়া হয়। বৎসরে তাঁরা একবার ছুটি পায়। যারা বাড়ি যেতে চায় তাদের বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়, আর যারা স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে চায় তাদেরও ব্যবস্থা করা হয়।'

শ্রমিকদের সামগ্রিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'দুপুর বেলা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি শ্রমিকদের জন্য যে কলোনি তা দেখবার জন্য। দু'মাইল লম্বা বিরাট কলোনি করা হয়েছে, আরও অনেকগুলো হচ্ছে। তার মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল করা হয়েছে। আমরা যখন গেলাম তখন স্কুল চলছিল। একটা ক্লাসে ঢুকলাম, ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মান দেখালো। আমরা ওদের থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল দেখতে গেলাম।'

বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সুযোগটিও শ্রমিকদের কাছে পৌঁছেছে। বাজারে যাবতীয় পণ্যসামগ্রী নির্দিষ্ট দামে পাওয়া যায়। নারী-পুরুষ উভয়েই ক্রেতা-বিক্রেতা। নারীশ্রমিকের মতো নারী বিক্রেতার পরিমাণ পুরুষের কাছাকাছি।

শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য যেমন স্কুল করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে খেলার মাঠসহ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। বাচ্চাদের খেলাধুলাও বাধ্যতামূলক। শিক্ষকরা খেলাধুলারও তত্ত্বাবধান করেন।

বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের আবাসনের অভ্যন্তরীণ চিত্র দেখার জন্য হঠাৎ একটা বাড়ি পরিদর্শন করতে চাইলেন। তখন দোভাষী তাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গৃহস্বামী কারখানায় কাজে গিয়েছেন। ভদ্রমহিলা বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন, আপ্যায়ন করলেন। অন্দরমহল দেখে চমৎকৃত হলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সতীর্থরা। খুবই সুন্দর, আসবাবপত্র দেখে মনে হয় যেন মধ্যবিত্ত পরিবার। 'শ্রমিকদের থাকবার ঘরে এত ভালো আসবাবপত্র ... আমার তো শ্রমিকের ঘরের আসবাবপত্র দেখে আশ্চর্যবোধ হলো। কারণ, আমাদের দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা তাহা কল্পনা করলে আর ওদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া উপায় কী?'

সদ্য বিয়ে করেছেন শুনে বঙ্গবন্ধু অনন্যোপায় হয়ে নিজের হাতের আংটিটি ভদ্রমহিলাকে উপহার দিলেন। পরের দিন এই দম্পতি হোটেলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে না পেয়ে একটা কলম উপহার দিয়ে আসেন। কলমটির নাম 'লিবারেশন পেন'। উপহার পেলে উপহার দিতে হয়। এটাই চীনের রীতি। বঙ্গবন্ধু উপহারটি পেয়ে আবেগাপ্লুত, 'যতগুলি উপহার পেয়েছিলাম, তার মধ্যে এইটাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান। শ্রমিকের উপহার, দিনমজুরের উপহার, পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে উপহার দেয়া হয় সেটাই সকলের সেরা এবং মূল্যবান।'

নয়াচীনের কৃষিব্যবস্থা বঙ্গবন্ধুকে বিমোহিত করেছিল। কৃষকদের জন্য কৃষি স্কুল করা হয়েছে। কৃষি স্কুলে যুবকদের স্বল্প মেয়াদে শিক্ষা

দিয়ে জমিতে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরকার জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছে। কৃষক নিজেরা জমির মালিক হয়ে অধিক উৎপাদনে মনোযোগ দিয়েছে। সারাদেশে সামান্য জমিও অনাবাদি নেই। আগে উৎপাদিত ফসলের বড়ো অংশই জমিদারদের দিয়ে দিতে হতো, চাষিদের অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হতো। এখন নয়াচীন সরকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা নেয়। কৃষকদের ফসল উদ্বৃত্ত থাকে। বঙ্গবন্ধু নয়াচীনের কৃষির উন্নতির মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, 'চীন সরকার কৃষির উন্নতি করেছে– মাথাভারী ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে নয়, সাধারণ কর্মীদের দিয়া।'

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর সঠিক বিকাশের পথ যে জাতি যত দ্রুত নিশ্চিত করেছে, সে জাতি তত দ্রুত উন্নতি করেছে। নয়াচীন সরকারের শিশুদের সুরক্ষায়, শিশুদের বিকাশে যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, বঙ্গবন্ধু তাদের শিক্ষাকে মূল্যায়ন করেছেন আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করে। 'আমাদের দেশের মতো কেরানি পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা আর নাই। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ধর্মাচার যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি-অধোগতিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের ধর্মাচার রাষ্ট্রের খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। নয়াচীন প্রতিষ্ঠার পরেই সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা যেমন নিশ্চিত করেছে, ধর্মভিত্তিক অরাজকতাও কঠোরভাবে দমন করেছে। এ কারণেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনে পর্বতসম সাফল্য পেয়েছে নয়াচীন। ধর্মব্যবসাও কঠোর হাতে দমন করেছে সরকার। সরকার গৃহীত নীতি মাত্র কয়েক বছরেই চীনকে তুলে এনেছে চিয়াং কাইশেকের যুগে নিত্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে। নয়াচীনের এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে তিনি

> বিষয়টি উল্লেখ করা এই জন্য যে, তাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছিল জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং মিথ্যা বলে তাদের আস্থা-সমর্থন-ভালোবাসা অর্জন করা যায় না। সারাজীবন তিনি এ বিশ্বাস বয়ে বেড়িয়েছেন

বঙ্গবন্ধু তাতে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, "এক এক দেশে এক এক প্রকারের 'স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণী' (প্রিভিলেজড ক্লাস) আছে– যেমন আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস', অন্য দেশে শিল্পপতিরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস'; কিন্তু চীনে দেখলাম শিশুরাই 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। এই প্রিভিলেজড ক্লাসটা সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।"

নয়াচীন সরকার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। সবার জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক শিশুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার ঠিক করে দিয়েছে, সেই পরিমাণ খাবার দিতে হবে। পোশাক ঠিক করে দিয়েছে, সেভাবে পোশাক দিতে হবে। কেউ না দিতে পারলে সরকারকে জানালেই সরকার সাহায্য করে। বিস্ময়কর এক জাতি গড়ে তুলছে নয়াচীন। ভালো খাবার, পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে নয়াচীনের শিশুদের চমৎকার বিকাশ শুরু হয়েছে।

নয়াচীন চার বছরের মধ্যেই শিক্ষায় বিপ্লব সাধন করতে পেরেছে। সবার জন্য বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পেরেছে। কৃষকের জন্য স্কুল, শ্রমিকের জন্য স্কুল, বয়স্কদের জন্য স্কুল যুগান্তকারী বটে। স্মরণ করেছেন তাঁর নিজ দেশে ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি সরলপ্রাণ মানুষের কথা।

হৃদয়ে স্বদেশ ধারণ করে এক তরুণ জননেতা গিয়েছিলেন নয়াচীনে শান্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে। এমন এক তরুণ ভ্রমণকালে লেকে নৌকা বাইতে গিয়ে দীপ্ত অহংকারে বলেছিলেন, 'আমি পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি।' সে হাল তিনি ধরেও ছিলেন। তাঁর মহানায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু ভ্রমণকালে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, চিন্তাধারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন আরও বড়ো অর্জনের জন্য। এমন এক তরুণ যিনি কেবল রাষ্ট্রাচারে মুগ্ধ নন, মুগ্ধ মানুষের জীবন মানোন্নয়নে। আর এ মানোন্নয়নের পেছনের সূত্রগুলো ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। মাও সেতুংয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, পিছু লাগতে ছাড়েননি সহযাত্রী আতাউর রহমান খান কিংবা মানিক মিয়ার। কিন্তু সারাক্ষণ হৃদয়জুড়ে ছিল স্বদেশ। আর দশটা তরুণের মতো স্রোতে গা না ভাসিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছেন বিস্ময়কর আত্মশক্তিতে বলীয়ান বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে জেগে ওঠা এক মহান জাতিকে।

লেখক: সাংবাদিক

যে পাইপ আজও জ্বলছে তারুণ্যের হৃদয়ে...

সারতাজ আলীম

পাকিস্তান আমলে ১৮ বার জেলে যাওয়া মানুষটির গায়ে পঁচাত্তরের এক ভোরে বিদ্ধ হলো ১৮টি গুলি। বছরখানেক আগে এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে সাথে মরতে চাই।' কিন্তু ওদের একাংশের হাতেই যে এত নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু হবে, সেটা কি তিনি কখনো ভেবেছিলেন? যে মোটা ফ্রেমের চশমা আর পাইপ হয়ে উঠেছিল একটা জাতির গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক, সেই চশমা আর পাইপ উদ্ধার হয় তাঁর নিথর-নিস্তব্ধ দেহে জড়িয়ে থাকা পাঞ্জাবির পকেট থেকে। ট্যাংক নিয়ে উল্লাস করতে থাকা ঘাতক দলের ভাবনায় কি ছিল এই পাইপ জ্বলতে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে! বলে রাখা ভালো, ঘাতক দলের আয়ত্তে থাকা ট্যাংকগুলোও এসেছিল তারই বদৌলতে মিসর থেকে, উপহার হিসেবে। পূর্ববর্তী শাসক নামধারী শোষকরা যখন ৫৬ হাজার বর্গমাইলকে লুটে প্রতিরোধের মুখে পালাল, তখন ধীরে ধীরে ৫৬ হাজার বর্গমাইলকে সোনার টুকরোয় পরিণত করার দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। শূন্য থেকে সোনার বাংলায় পরিণত করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করি– ১৮ বার জেলে যাওয়া মানুষটি না থাকলে আজ হয়তো সবুজের বুকে লাল পতাকার কোনো অস্তিত্বই থাকত না। আজকের বাংলামোটরের নাম থেকে যেত পাকমোটর, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করার উল্লাসে মাতোয়ারা হওয়ার সুযোগই হয়তো থাকত না। কারণ শোষকরা আমাদের বিশ্বমঞ্চে অংশই নিতে দিত না। গার্মেন্ট সেক্টরে আমাদের যে অর্জন, সেই শিল্পের জন্মই হতো না। গার্মেন্ট বা অন্যান্য ভারি শিল্পকারখানা স্থাপন করতে চাইলে অনুমতির জন্য যেতে হতো পশ্চিমে। পশ্চিমের ব্যর্থ রাষ্ট্রটির অংশ থেকে গেলে আমরা

হয়তো পারমাণবিক বোমার ভাগীদার হতাম কাগজে-কলমে তবে সেটার পরীক্ষা হয়তো করা হতো আমাদেরই মাটিতে। আর পারমাণবিক বর্জ্য ফেলা হতো দক্ষিণের সাগরে, যেমনটা ইউরোপীয়রা করেছে সোমালিয়ায়। সবমিলে আমরা হতাম পশ্চিমের ব্যর্থ রাষ্ট্রটির একটা ভাগাড় মাত্র এবং আমাদের কোনো অর্জনই থাকত না। কৃতজ্ঞতা হিসেবে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলাটা ছিল আমাদের সবার দায়িত্ব। কিন্তু জাতির অকৃতজ্ঞ কিছু পাপাচারী তাঁকেই ঘায়েল করল বুলেট দিয়ে। এরপর অনেক পিছিয়ে গেলেও ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠেছে ৫৬ হাজার বর্গমাইল। চুয়াত্তরের ভাষণে খুব গর্ব করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখব। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করব।' তরুণদের নিয়ে সব সময় বড্ড আশাবাদী ছিলেন, নিজের তারুণ্য যৌবন ঢেলে দিয়েছিলেন দেশ ও দশের সেবায়। ৭ মার্চ বিকাল ৩টায় কলরেডির মাইকের পেছনে আকাশমুখী আঙুল আর বজ্রকণ্ঠেও গুরুদায়িত্বটা যেন তরুণদেরই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' দুটি বইয়েই তারুণ্যের ওপর বিশ্বাস এবং নিজের তরুণ জীবনের সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তিনি লিখে গেছেন। '৫২ সাল থেকেই তরুণদের মাঝে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন। যদিও তরুণ হিসেবে মানুষের সেবা করার ইতিহাসটা অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকেই। নেতাজি সুভাষের আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে অনেকবারই তাতে শামিল হওয়ার ঘটনা দেখা যায়। তরুণদের ভেতর স্বাধীনতার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেওয়া মানুষটিকে কী করে ভুলবে তরুণরা? এ কথা সত্য যে, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার স্থপতিকে উপলব্ধি করতে তরুণদের বেশ কষ্টই হয়েছে। তবে আকাশ থেকে কালো মেঘ একসময় ঠিকই দূর হয়েছে। তরুণরা পুনরাবিষ্কার করছে তাদের মহামানবকে, তাদের আইকনকে, তাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

এই মুজিববর্ষে তরুণ হিসেবে আমরা অন্তত একটি ভালো কাজের শপথ নিতেই পারি। ছোটো-বড়ো যে কাজই হোক সেটা। হোক সেটা রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা না ফেলা বা একদিন নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া বা ভবিষ্যতে দুর্নীতি না করার শপথ করা। যে মহামানবের সম্মান, শক্তি, আস্থার জায়গা ছিল তারুণ্য, সেই তারুণ্যের অংশ হিসেবে আমরা তাঁকে সম্মান দেখিয়ে না হয় একটু একটু করে ইতিবাচকতার দিকে বদলে যাই। আর এভাবেই তো গড়ে উঠবে সোনার বাংলা! জ্বলতে থাকুক সেই পাইপ!

লেখক: শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তারুণ্যের আঁতুড়ঘর বঙ্গবন্ধু

এমএসবি নাজনীন লাকী

বঙ্গবন্ধু এক অবিসংবাদিত আদর্শের নাম। স্বার্থহীনভাবে অপরের জন্য কাজ করার এক অনুপ্রেরণার নাম। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কারিকর, উদার ব্যক্তিত্ব, জনমানুষের নেতা, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, সফল রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম দিয়ে শুরুর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারেই কাটিয়েছেন তাঁর ২০ হাজার ২৩৬ দিনের জীবনে।

বঙ্গবন্ধু তারুণ্যের আঁতুড়ঘর। দেশ ও দেশের জনগণের জন্য ন্যায়সংগত সংগ্রামে ভরপুর তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ। কখনোই তিনি আত্মস্বার্থের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিতের কথা আর ভেবেছেন বাংলার স্বাধীনতার কথা তারুণ্য শক্তির ধারক-বাহক হয়ে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চেতনার এক অনির্বাণ শিখা। তিনি তরুণদের নাড়ির স্পন্দন, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। তাই তরুণ সহযোগীদের নিয়ে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে গঠন করেছিলেন 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। আর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি গঠন করেন 'ছাত্রলীগ'। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের মানুষকে না গড়ে, দেশের মানুষকে মবিলাইজড না করে পরিষ্কার আদর্শ নিয়ে চলা যায় না। তাই তরুণদের চিন্তাচেতনায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মুক্তিবার্তা। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' আজকের তরুণদের কাছেও মুক্তির বার্তা ও প্রতিবাদের ভাষা। তাঁর আপসহীন সংগ্রামী জীবন, অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে সদাপ্রতিবাদী উচ্চারণ– আজও তরুণদের সঞ্জীবনী শক্তি। তারুণ্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল অবিচল। যার অন্তরঙ্গ প্রমাণ এই বই দুটি। তিনি তরুণদের বলছেন, 'যেখানে অন্যায়-অবিচার, সেখানে প্রতিবাদ করো; মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে যেসব ব্যক্তি

ও প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা ও স্বার্থের ঘর বড়ো করে তাদের প্রতিরোধ করো।' তিনি বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেন। মানুষে মানুষে বিভাজনকে ঘৃণা করতেন। তাঁর দর্শন ছিল এক বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতায় আদর্শ মানবতার উদ্দীপনা। আজকের তরুণদের জন্য বিশ্বমানব হিসেবে গড়ে ওঠার এক অনন্য অবিসংবাদিত আদর্শ। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে ১৯৭২ সালের ৭ জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।' যা আজকের তরুণসমাজের অসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধের এক অমোঘ আদর্শ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের এক অসাধারণ মন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' পেশ করেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে– যা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন ২৩ মার্চ। এরপর তিনি তারুণ্যের শক্তি কাজে লাগান। দেশব্যাপী জনসভা, জনসংযোগ শুরু করেন। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই ভিড় জমে যেত তাঁকে একনজর দেখা এবং তাঁর কথা শোনার জন্য। তরুণরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে। তাঁর ওই সময়কার প্রতিটি সমাবেশে একটি বিশেষ কোট ব্যবহার করতেন, যেটা 'মুজিব কোট' নামে পরিচিতি পায়। সেই কোটের মাধ্যমে ছয় দফার লালন ও প্রচার করে বাঙালি জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখান। সেই কোটে ছিল ছয় দফার ছয়টি বোতাম, দেশীয় কাপড়ে তৈরি এবং রং ছিল কালো। বাংলা জনসাধারণ বিশেষ করে বাংলার তরুণসমাজ সেদিন জেগেছিল তাঁর উদ্দীপনায়। যার প্রমাণ ছাত্রদের উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান।

বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন রাজনৈতিক আদর্শে জড়ানো থাকলেও তিনি অরাজনৈতিক বঙ্গবন্ধু। তাই তো বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের গণঅভ্যুত্থানে কারাগার থেকে মুক্তি পেলে ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর সভাপতি ও ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ রেসকোর্স তথা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংবর্ধনা সভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেদিন তরুণরা বুঝে গিয়েছিল শেখ মুজিবই বাংলার ত্রাণকর্তা। বাংলার স্বাধীনতার নায়ক।

বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা, যিনি তরুণ সমাজকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের সঙ্গী করেছেন। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত তরুণরা দূরদর্শিতায় দীক্ষিত 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করে পল্টন ময়দানের সমাবেশে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকার রেসকোর্স তথা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাঙালির স্বাধীনতার ডাক দেন, তখন দেশের সব

বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা, যিনি তরুণ সমাজকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের সঙ্গী করেছেন

মানুষের কাছে এই বার্তা তরুণরাই পৌঁছে দেয় সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে। বাংলার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠল এক একটি দুর্গ। তরুণদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অন্তরের সম্পর্ক থাকায় অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার বার্তা সহজেই পৌঁছে যায় বাংলার প্রতিটি ঘরে। সচেতন হয় বাংলার মানুষ এবং সর্বতোভাবে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে তরুণরা বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেছিল স্বাধীনতার জন্য। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আজও তরুণ সমাজকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর কর্মময় জীবন ও আদর্শ তরুণদের এগিয়ে চলার পাথেয়। বঙ্গবন্ধুই বাংলার তরুণদের সঞ্জীবনী শক্তি। বঙ্গবন্ধু কোনো নির্দিষ্ট দলের আদর্শ নন, তিনি বাঙালির আদর্শ। তিনি নেতা, বাঙালি জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বিশ্বসভায় রাজনীতির কবি ও বিশ্ববন্ধু-কিংবদন্তি মহানায়ক। তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। তাঁর তুলনা শুধুই তিনি। বঙ্গবন্ধু দলমত-নির্বিশেষে সবার। তিনি নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার নন। তিনি স্বতন্ত্র। প্রজন্ম জানুক বঙ্গবন্ধুই তারুণ্য। বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। এই মুজিববর্ষে প্রতিটি তরুণের স্লোগান হোক– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক: সমাজকর্মী, ময়মনসিংহ

বঙ্গবন্ধু বাঙালির আদর্শিক ফিলোসফি ও প্রেরণা

হায়দার মোহাম্মদ জিতু

দিন কিংবা মুহূর্তের ভাবনা প্রত্যেক সময়ই ভিন্ন স্বাদের এবং এর থাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ আবেদন। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়ে থাকে। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই গুরুত্বের সংজ্ঞা বদলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে একক নেতৃত্বদানকারী ও সংগঠনকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার উত্তরাধিকারের জন্য এই বছরের আবেদন নান্দনিক, প্রেরণার এবং গুরুত্ববহ। সংক্ষেপে প্রকাশ করলে এর আবেদন সমগ্র বিশ্বের।

জাতি হিসেবে এই গৌরব আজ বিশ্ব বাঙালির। কারণ বেশকিছু মিশন ও ভিশন নিয়ে এই সময়টাকে মোকাবিলা এবং উদ্‌যাপনের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। এই সময়েই, ২০২০ সালে বাঙালি জাতির জীবনের অগ্নিপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যা একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-সাক্ষী হতে চলেছে। আনন্দিত হওয়ার কারণ, যে চক্রগুলো এই স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নামটি পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল, আজ সেই চক্রগুলোও কাছে-দূরে থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অংশ নিচ্ছে! তবে এই অংশগ্রহণ যদি কৌশল না হয়ে আত্মার বনে যায় তবে তা অবশ্যই আনন্দের। কিন্তু তা যদি হয় আরোপিত কিংবা সুযোগ সন্ধানের, তবে তা হবে বেদনার।

কারণ, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশ এখন চালকের আসনে। শুধু তা-ই নয়, এই রাষ্ট্র আজ বিশ্বব্যাপী এমন প্রতাপের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করছে যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শত্রুগুলো একে রক্তাক্ত করার চেষ্টায় আছে। তবে উন্নয়নচিন্তা বাস্তবায়নই হবে এই বেদনার

জবাব এবং তা করতে হবে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কৌশলে। কারণ সরাসরি নয় বরং সিস্টেমগুলোয় ছদ্মবেশ ধারণ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে টেনে ধরার একটা পাঁয়তারা প্রক্রিয়া চলমান আছে। তাছাড়া ২০২১ সালও এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী বাঙালির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই বছরেই বাঙালি পূরণ করতে যাচ্ছে তাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী।

তবে এই সুবর্ণজয়ন্তীতে বাঙালির প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধুকে সর্বজনীন করে তোলা। কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ শুধু বাঙালির নয়, গোটা বিশ্বের। যদিও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়টায় পাকিস্তানিরা তাঁকে শুধু বাঙালির নেতা– এই গণ্ডিতে বন্দি করতে চেয়েছিল। সেটাও ছিল বাঙালিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর অভিমুখী চক্রান্তের। অর্থাৎ তারা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে জাহির করতে। কিন্তু আদতে দেখা যায়, সেই জেল-জুলুমের খড়্গে বঙ্গবন্ধু দিনে দিনে হয়ে উঠেছিলেন আরও পরিণত এবং বৈশ্বিক। জীবনে ৪,৬৮২ দিন কারাবরণের পাশাপাশি মৃত্যুভয়ে ভীতি করতে জেলখানাতেই তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। এছাড়া নানা নিপীড়ন তো ছিলই। যদিও এটা তাঁকে আরও ঋদ্ধই করে তুলেছিল। কারণ এই ধরনের জুলুম-নিপীড়ন এবং অত্যাচারের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজব্যবস্থার ক্ষমতা কাঠামো এবং এই ব্যবস্থায় কে শোষক এবং কে শোষিত। আর এ কারণেই লড়াই চালিয়েছিলেন শোষক পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। ফলে বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বগুণে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। বিশ্ব ফোরাম জাতিসংঘের মাধ্যমে পৃথিবী দেখেছে শোষিতের পক্ষে দাঁড়ানো শেখ মুজিবকে।

পৃথিবীতে সবকিছুর তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যাশা অসম্ভব। যেমন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে চক্রগুলো ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে তারা বাঙালির মনন-মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু ওরা ভুলে গিয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন না। ততদিনে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আদর্শিক ফিলোসফি ও প্রেরণা। ফিলোসফিকে আর যাই হোক নিঃশেষ করা যায় না। শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্রের মতো তা ফিরে আসে নানা আঙ্গিকে। তবে একে ধারণ করে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে সাহসী হয়ে উঠতে হয়। আর বাঙালি জাতির জীবনে সেই শান্ত সাহসের নাম শেখ হাসিনা। অবিরাম মৃত্যুবাণ এবং মৌলবাদকে উপেক্ষা করে আজ তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একক আলোক পাখি।

পদার্থবিজ্ঞানের শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্রমতে, শক্তি কখনই ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না। একে শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। সে হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের বুকে আজ তেমনভাবেই ফিরে এসেছেন। তাঁকে লালন, ধারণ এবং অনুভব করতে বিশ্বের ১৯৫টি দেশ আজ মহাসমারোহে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এর অন্যতম আরেক কারণ হলো– বর্তমান বিশ্ববুকে বাঙালির উন্নয়ন অগ্রযাত্রা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মান অনুযায়ী একটি মজবুত অর্থনীতির জন্য একটি দেশের মাথাপিছু আয় প্রয়োজন কমপক্ষে ১ হাজার ২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে প্রয়োজন ৬৬ পয়েন্ট, সেখানে বাংলাদেশের অর্জন ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হয় ৩২ ভাগ বা এর কম, সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিস্তৃত অর্থে বললে– এ ধরনের আরও হাজার সূচকে বাংলাদেশ আজ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই সূচকগুলো বাঙালির

> তিনি গড়ে উঠেছেন এই বাংলার সংস্কৃতি, সমাজ এবং মানুষের ভেতর থেকে। আর ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, যে কোনো দর্শন গড়ে উঠে এসবের ভেতর থেকেই

জীবনে দীর্ঘমেয়াদি কোনো ফল বয়ে আনতে পারবে না। কারণ ক্ষেত্রবিশেষে বা কিছু কিছু স্থানে আজ এই সমাজব্যবস্থার এমন দশা যে, এর ভিত্তি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে; কিন্তু উপরি চুনকাম-রঙে কেউ থেমে নেই। সবাই ব্যস্ত কাজ করার অভিনয়ে। তাই মুজিব শতবর্ষের প্রয়োজন একটা সহনশীল সমাজের প্রত্যয় করা। যে সমাজব্যবস্থায় একের কষ্টে অন্যজন দুঃখী হবে এবং সহযোগিতার জন্য তৎপর কিংবা এগিয়ে আসবে। আবার আনন্দে সবাই একসঙ্গে ভাসবে। তবে তা হতে হবে অবশ্যই মন থেকে, লোক দেখানো নয়।

পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে-জানতে এবং সব বয়স উপযোগী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জরুরি। কারণ, বাংলার তরুণ-তরুণীদের সহনশীলতা এবং মানবিকতা শিক্ষার জন্য বড়ো বড়ো বৈশ্বিক মনীষী কিংবা মডেল প্রয়োজন নেই বরং একক বঙ্গবন্ধুই যথেষ্ট। এই বঙ্গবন্ধুই দেশের টানে দিনের পর দিন পরিবার ছেড়ে জেলখানায় কাটিয়েছেন। কয়েকের পরিবার থেকে গোটা বাংলাদেশকেই পরিবার হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন এবং তার পাশে-সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যে জায়গায় সবাই তাঁর কথায় যার যা ছিল তাই নিয়েই একাট্টা হওয়ার মানসিকতায় জেগে উঠেছিল।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষ বড়ো বিচ্ছিন্ন। বদ্বীপের মাঝে যেন গজে উঠেছে হাজারও চোরাগুপ্তা বদ্বীপ। পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার বড়ো অভাব। কাজেই এর সমাধান একক বঙ্গবন্ধুই। কারণ তিনি গড়ে উঠেছেন এই বাংলার সংস্কৃতি, সমাজ এবং মানুষের ভেতর থেকে। আর ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, যে কোনো দর্শন গড়ে উঠে এসবের ভেতর থেকেই। কাজেই একক তাঁকেই অবলোকন-অনুসরণ এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে ধারণ এবং লালন করলেই একজন সামাজিক সহনশীল মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব। আর এজন্য ক্ষণস্থায়িত্বসম্পন্ন আতশবাজি কিংবা অন্য কোনো চাকচিক্যের খপ্পরে না পড়ে মুজিববর্ষকে যথাযথভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সব বয়স উপযোগী করে উপস্থাপন এবং তাদের মাঝে মানুষের জন্য করার ভাবনা জাগ্রত করতে পারলেই মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কী আর মৃত্যুদিনই বা কী?'

কাজেই বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করার অর্থ যে জনগণের জন্য নিজেকে নিবেদন করা, জনগণের জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে তৈরি করা– তরুণ প্রজন্মের কাছে সেই বোধ জাগ্রত করা জরুরি। বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার শেখ হাসিনা যা উপলব্ধি করেছেন। যার আলোকে জনগণের সেবায় দিনরাত প্রত্যেক সেবার খাতকে আরও যুগোপযোগী এবং স্বনির্ভর করার মহাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিকভাবে একটি জাতির উন্নয়নকে মাপজোখ করা হয় তার যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখে। সে হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সড়কপথকে আরও সমৃদ্ধ, সহজতর এবং জনবান্ধব করে তুলতে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিত্যনতুন মহাসড়ক নির্মাণ এবং বিনির্মাণের উদ্যোগ। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে ৪০১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সম্পদ-সৌন্দর্য নৌপথকে বৈশ্বিকভাবে যুগোপযোগী করতে নির্মাণ এবং বিনির্মাণ করা হচ্ছে আরও নতুন নতুন পথ। আর এ সবকিছুকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া। যাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

কাজেই সব মিলিয়ে বাংলা এবং বাঙালির যে ভবিষ্যৎ 'জয়যাত্রা', তাকে সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নিতে জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়া আবশ্যক। কেবল এটাই পারে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন চিন্তা বাস্তবায়নের নাইয়া পার করাতে, হিন্দু-মুসলমানসহ সব বাঙালির সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। পাশাপাশি নজরদারি রাখতে হবে কাউকে ঠকিয়ে জিতে যাওয়ার চেষ্টায় কেউ যেন নিজের বিবেকবোধের কাছে ঠকে না যায়। কারণ এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের অধিকার এখন অন্য দখলদারের নয়, সমগ্র বাঙালির, বিশ্ব বাঙালির। তাই এই মুজিববর্ষের আরেক প্রত্যাশা, মুজিবের বাংলায় জাগ্রত হয়ে উঠুক বৈশ্বিক মানবসত্তা, মুজিবের মানবসত্তা।

লেখক: প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু

মোয়াজ্জেম হোসেন

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, বাংলাদেশ– এ শব্দগুলো একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত, অভিন্ন এক শব্দ। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই এসে যায় বঙ্গবন্ধুর জীবনগাথা। জনগণের জন্য তাঁর অপার্থিব ভালোবাসা ও বাংলাদেশের ইতিহাস। ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু এই আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলায় রাষ্ট্রদোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর সেসময় শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে পূর্ব বাংলার জনগণ দুর্বার আন্দোলনকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। আর এই আন্দোলনে শেখ মুজিব মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত জননেতায় পরিণত হন।

সাহসী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কখনো মাথা নত করেননি বঙ্গবন্ধু। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে যেদিন গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেদিনও তিনি ছিলেন অনমনীয়। তাঁকে জেলগেটের ছোটো দরজা দিয়ে বের হতে বললে তিনি রাজি হননি। পুরো দরজা না খুললে তিনি বের হবেন না, কারণ শেখ মুজিব মাথা নিচু করতে জানেন না। ছোটো গেট দিয়ে বের হতে হলে মাথা নিচু করতে হয়। এটা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাতি গঠনের পুরোধা ছিলেন শেখ মুজিব। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও কোনো সংকোচ ছিল না তাঁর। দেশের জনগণের ওপর তাঁর অপার আস্থা-বিশ্বাসের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ১৯৭২ সালে এক

সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার শক্তি কোথায়?' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি।' ডেভিড ফ্রস্ট আরও জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর আপনার দুর্বল দিকটা কী?' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

৩০ লাখ শহিদের তাজা রক্ত আর ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম হারিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রাতেই লন্ডন যান। বেশকিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রাজকীয় কমেট বিমানে ৯ জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধু দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। ১০ জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে সেখানে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতিতে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে সৌজন্য কথাবার্তার পর ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানেই ঢাকা আসেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিকেল ৩টার দিকে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু। এ দিনেই তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত জনসভায় দেওয়া ভাষণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। অনেক কাজ আছে, যা করা জরুরি।' আর সদ্যস্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশটিকে মাত্র সাড়ে তিন বছর পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন একপ্রকার অসাধ্য কর্মসূচি।

অনেকে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি আবার অনেকে উন্নয়নের পরীক্ষাগার বলে আখ্যায়িত করেছিল। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে জাতির উদ্দেশে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই অঙ্গীকার তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য; যুগের পর যুগ বাঙালি দুচোখ ভরে যে স্বপ্ন লালন করেছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য; স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি সময়োপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এককথায়– বাংলাদেশের উন্নয়নের শক্ত ভিত বঙ্গবন্ধুই রচনা করে গেছেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত অবকাঠামো, অর্থনীতির পুনর্গঠন, ভারত প্রত্যাগত ১ কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন, স্বাধীন দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় প্রভৃতি বহুমুখী কাজের চাপ, কৃষি বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ– এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধুকে দেশ এগিয়ে নিতে হচ্ছিল। এত চাপের পরও বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের আস্থার বরখেলাপ করেননি। তিনি সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। নিচে এর কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি

কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি না হলে যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না, তা বঙ্গবন্ধু গভীর চিত্তে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর এজন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদাদান করেন। সেদিন ভাষণে কৃষিবিদদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রাকটিক্যাল কাজ করতে হবে। প্যান্ট-শার্ট-কোট ছেড়ে মাঠে না নামলে বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব ঘটানো যাবে না।' কৃষি ও কৃষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। সেজন্যই তিনি সব সময় দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গঠনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোটা কৃষিব্যবস্থাকে ব্যাপক আধুনিকীকরণ ও বাস্তবমুখী অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

সংবিধান তৈরি ও নির্বাচন

পুরো জাতির আপ্রাণ চেষ্টা, দুচোখে লালিত স্বপ্ন আর ৩০ লাখ শহিদের তাজা রক্ত এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত হারিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেই স্বাধীনতার আদর্শেই ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর রক্তে লেখা এক সংবিধান রচিত হয়। দ্রুত দেশের সংবিধান রচনার উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুই নিয়েছিলেন। সংবিধান রচনার পরপরই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতেই বোঝা যায়, কতটা গণতান্ত্রিক ছিলেন শেখ মুজিব।

বিভিন্ন সংস্থা জাতীয়করণ

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার বাংলাদেশের সব ব্যাংক-বিমা এবং পাট ও বস্ত্রশিল্প জাতীয়করণ করেন। পাকিস্তানের মতো অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের পথ রুদ্ধ করার জন্য পুঁজির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেন। গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে জমির সিলিং ১০০ বিঘায় সীমিত করেন। এ ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছিল না কোনো অবকাঠামো, ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠানও। ১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় দিবসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্যুভেনিয়রে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যায়, যুদ্ধচলাকালীন তিন শর বেশি রেলসেতু এবং তিন শর বেশি সড়কসেতু পাকিস্তানি বাহিনী ধ্বংস করেছে। ২৯টি জাহাজ ডুবিয়ে বন্দরের প্রবেশপথ অচল করে দেওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের পরপরই পুরো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচিরেই চালু করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। ১৯৭৩ সালের ১৮-২৪ অক্টোবর জাপান সফরকালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের সূচনা করেন। পরবর্তী বছরগুলোয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, তিস্তা ও ভৈরব রেলওয়ে ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস ও বাড়ি নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী, মিলিশিয়া, রিজার্ভ বাহিনী সংগঠনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র নিজেদের কাছে না রেখে তা ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সমর্পণের আহ্বান জানালে মুক্তিযোদ্ধারা সাড়া দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দেন। তৎকালীন মার্কিন দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে পাঠানো এক বিশেষ প্রতিবেদনে জানায়, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যেভাবে প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করেন তাতে মনে হয়নি বাংলাদেশ মাত্র এক বছর আগে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্ব হারানো নারী, শিশু ও অন্যদের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জুনে ১ লাখ ৬৬ হাজার বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ

বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৪২টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করে। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিল, 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরী মনোভাব নয়।' এছাড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য লাভ করে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি, যিনি একটি দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

দেশ পুনর্গঠনে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনদরদি। দেশ ও দেশের জনগণের জন্য সর্বদা তাঁর মন আনচান করত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র্যদূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দারিদ্র্য দূর করা; সবার জন্য কর্মসংস্থান; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। এছাড়া ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করতে উদ্যোগ

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস গ্রামে। সেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য 'বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়' চালুর সিদ্ধান্ত নেন বঙ্গবন্ধু। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি মানুষ যেন কাজ করতে পারে, সেজন্য সবাইকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে।'

স্বাস্থ্যব্যবস্থার মানোন্নয়নের উদ্যোগ

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ৫০০ ডাক্তারকে গ্রামে নিয়োগ করেন।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

শোষণ, নির্যাতন আর লুটপাট করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশের কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সব ক্ষেত্রে তারা এদেশের শান্তপ্রিয় মানুষকে ঠকিয়েছে। বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বদেশে ফিরেছিলেন, সেদিনই রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার অফিসারদের হুঁশিয়ার করছি কেউ যেন ঘুস না নেয়, এই মাটিতে দুর্নীতিকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।' আর যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে গড়তে, সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করতে ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

> সেদিন ভাষণে কৃষিবিদদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রাকটিক্যাল কাজ করতে হবে। প্যান্ট-শার্ট-কোট ছেড়ে মাঠে না নামলে বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব ঘটানো যাবে না'

জেল-জুলুম, অত্যাচার, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র– সবকিছু সহ্য করেও বাংলার মানুষের সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেননি বঙ্গবন্ধু। বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধুকে বর্ণনা করতে গিয়ে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।' কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য– বাংলাদেশকে গড়ার সুযোগ বঙ্গবন্ধু পাননি। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা সেই সুযোগ দেয়নি। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে ইতিহাসের পাতা থেকে শেখ মুজিবের নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এমন মহামানবকে কি এত সহজেই মুছে ফেলা যায়? ইতিহাসের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম পৃথিবীর বুকে আজীবন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বারবার ষড়যন্ত্রের পরও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে আছেন বঙ্গবন্ধুর অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্যই। শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলছেন তিনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জেগে থাকবে।

লেখক: সাংবাদিক

চেতনায় বঙ্গবন্ধু

কামাল হোসাইন

মুজিব একটি নাম। শেখ মুজিবুর রহমান একটি গর্ব, একটি অহংকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিষ্ঠান, একটি দেশের ভিত্তি, একটি প্রেরণা, একটি জেগে ওঠার নাম।

দিনটি ছিল ১৭ মার্চ, ১৯২০ সাল। অন্যান্য দিনের মতো এই দিনটাও স্বাভাবিকভাবে কেটে গেছে বেশকিছুটা বছর। দিনটি সুপ্ত অবস্থায় ছিল আমাদের কাছে। কে জানত এই দিনে জন্ম নেওয়া সেই খোকাই আমাদের দেশ স্বাধীন করার অগ্রনায়ক হবেন। শেখ মুজিব যে বড়ো হয়ে কিছু একটা করবেন, সেটা তাঁর অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় রাস্তা অবরোধ করে স্কুলের দাবি আদায় করার সময়ই বোঝা গিয়েছিল।

সবার কাছে যে তিনি আজ মহান হয়ে আছেন, এটা এমনি এমনি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই তিনি এদেশের মানুষের জন্য, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে রাজনীতি করে আসছেন। ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ভাষা আন্দোলনেও তিনি মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলন করে কারা ভোগ করেছেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ও দক্ষতার কারণে তিনি অল্প বয়সে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই পড়ে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। তাঁর জীবনটাই গেছে সংগ্রামে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানদের কাছ থেকে দাবি আদায়ের জন্য, ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। নিজের জন্য কোনো সংগ্রাম করেননি। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য নিজের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে অনেক

ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। যে কোনো কাজে মুজিবকেই পাঠাতেন। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন তাঁর ভরসার পাত্র। আর বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সঙ্গে কোনো আপস করতেন না। একদিন কোনো একটা কমিটিতে সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে বললেন, অমুককে তোমাদের দলে রেখ। শেখ মুজিবের সাফ সাফ কথা, 'সে ভালো লোক নয়– তাকে আমি কমিটিতে রাখতে পারব না।' সোহরাওয়ার্দী রেগে গেলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'Who are you? Why you come here?' মুজিবের তাৎক্ষণিক উত্তর, 'I will be prove that who am I and you must be call me.' মুজিব চলে যাচ্ছেন, বেশ কিছু দূর চলে গেলেন। সোহরাওয়ার্দী লোক পাঠালেন এবং বললেন, 'তাড়াতাড়ি ওকে ঠেকাও, ও রেগে গেছে, চলে গেলে আর আসবে না।' সেই ব্যক্তি মুজিবকে ঠেকালেন এবং ফেরত আনলেন। সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে বললেন, 'তুই কেন আমার ওপর রাগ করিস, তুই জানিস না, তোকে ছাড়া আমার চলে না'– এই বলে মুজিবকে জড়িয়ে ধরলেন। মুজিব তাঁর ভালোবাসায় চোখ দিয়ে অশ্রু ছেড়ে দিলেন।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে কতটা ভালোবাসতেন, তাই তাকে প্রায়ই মিস করতেন তিনি। সোহরাওয়ার্দীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবর জিয়ারত করে ওইখান থেকেই বাংলাদেশের নামকরণ করলেন যে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ। আর সেই নামেই আজ আমরা গর্ব করছি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলাম। ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে বারবার কারাভোগ করেছেন। শেখ মুজিব ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য না ভেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভেবেছেন। দেশবিরোধী কোনো কাজে আপস করেননি।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কারণে সারাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওই ভাষণটি সারাবিশ্বে অন্যতম ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি হিসেবে পরিচিত। এই রাত্রে তাঁকে গ্রেফতার করলে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। তারপর থেকেই শুরু হয় চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা পেলাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়, একটি স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে দেশদ্রোহিতার মামলায় ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। তাঁর জেলখানার পাশেই কবর খোঁড়া হয়েছিল তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য। মৃত্যুর পরোয়ানা শুনেও তিনি পাকিস্তানিদের কাছে ক্ষমা চাননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। মুসলমান একবার মরে, বারবার না।' বাঙালি জাতির সঙ্গে তিনি বেইমানি করেননি। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

তিনি বিশ্বে মহান নেতা হিসেবে এবং তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বিবিসি বেতারের জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন। সেদিনের সেই জরিপে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দিতে পেরে নিজেকে গর্ববোধ করি।

কবিগুরু তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।' বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ ডিসেম্বর দেশে আসেন। বিমানবন্দরে নেমেই কবিগুরুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'হে কবি আপনি দেখে যান, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।' খন্দকার মোশতাকরা মুখোশ পরায় সেদিন বঙ্গবন্ধু তাদের চিনতে পারেননি। মোশতাকদের মতো মানুষকে বিশ্বাস করায়, ভালোবাসায় তাঁকে সপরিবারে জীবন দিতে হয়েছে। মীর জাফরকে বিশ্বাস করে যে ভুল করেছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সেই ভুলই করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই মহান নেতার জন্মশত বছর পালন হতে যাচ্ছে। ২০২০ সাল হচ্ছে মুজিববর্ষ। বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধু হোক আমাদের দেশপ্রেমে প্রেরণার উৎস।

'দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে বারবার কারাভোগ করেছেন। শেখ মুজিব ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য না ভেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভেবেছেন। দেশবিরোধী কোনো কাজে আপস করেননি'

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা

মিহির কান্তি ঘোষাল

বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনীতির সাধনার মূলে অন্যতম আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও সব ধর্মের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সমান ভালোবাসা। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এর মূলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ। দেশের হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। সদ্যস্বাধীন একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সম্বল বলতে ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণ আর আত্মবিশ্বাস। অর্থনীতি, অবকাঠামো, যোগাযোগব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে। বিশ্বে তখন তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছিলেন একই সম্মেলনে অংশ নেওয়া কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। এ সম্মেলনে বৈঠক হয় লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ও সৌদির বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে শর্ত দেন, বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করলে তাঁরা স্বীকৃতিসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেবেন। গাদ্দাফি বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চান, বাংলাদেশ তাঁদের কাছে কী চায়? বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা চাই লিবিয়ার স্বীকৃতি। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি লিবিয়ার স্বীকৃতি।' গাদ্দাফি জানান, এর জন্য বাংলাদেশের নাম বদলে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু পালটা জবাব দেন, 'এটা সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ সবার দেশ। মুসলমান, অমুসলমান– সবারই দেশ।' বঙ্গবন্ধুর এ দৃঢ়চেতা বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় তিনি সব ধর্মের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

এবং নিজ দেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা রক্ষায় কতটা দৃঢ়চেতা ছিলেন।

অসাম্প্রদায়িকতা ছিল বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ। ১৯৪৬ সালে যখন কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো, তখন বঙ্গবন্ধু দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় গিয়ে কাজ করেছেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন করলেও তিনি কখনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেননি। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে সর্বসাধারণের দলে পরিণত করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। এর ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না, রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি সংবিধানে জাতীয় চার মূলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংযুক্ত করে বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে; যারা সাম্প্রদায়িক, তারা হীন, নীচ; তাদের অন্তর ছোটো। যে মানুষকে ভালোবাসে, সে কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক– সব মানুষ তাঁর কাছে সমান। সেই জন্যই এক মুখে সোশ্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আরেক মুখে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করনি। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না করতে পারে।'

জাতি-ধর্মবর্ণ, নির্বিশেষে একসঙ্গে বসবাস করতে গেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, তাঁর আদর্শ, তাঁর দর্শন চর্চা করলে দেখতে পাই, তিনি ছিলেন চিন্তাচেতনা মননে একজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ। আজ দেশ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পথেই এগিয়ে চলছে।

লেখক: সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

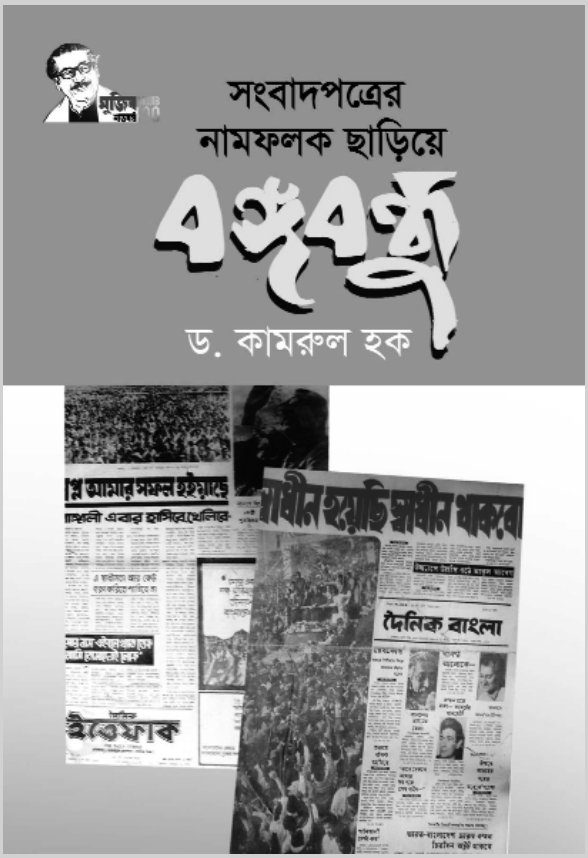

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ

তাপস হালদার

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, দুটি ভিন্ন নাম; কিন্তু ইতিহাসের এক সুতোয় গাঁথা। মহাত্মা গান্ধী, মাও সেতুং, হো চি মিন, লি কুয়ান ইউ, কামাল আতাতুর্ক, সুকর্নো, নেলসন ম্যান্ডেলা, জর্জ ওয়াশিংটনকে বাদ দিয়ে যেমন তাদের দেশের ইতিহাস লেখা যায় না, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসও অসম্ভব। তিনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। বাঙালি জাতির স্বপ্নসাধক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জাতিকে নিয়ে শুধু স্বপ্নই দেখতেন না, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখাতেন। তিনি একটি দেশ তথা জাতির মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ১৭ মার্চ ১৯২০ সাল, বাঙালি জাতির জন্য মুক্তির মশাল হাতে জন্ম নিয়েছিল একজন মহামানব, নাম তাঁর খোকা। টুঙ্গিপাড়ার খোকা একসময় শেখ মুজিব নামে পরিচিত হলেন। রাজনীতিতে এসে হলেন শেখ সাহেব, উনসত্তরে বঙ্গবন্ধু, একাত্তরে মহান বাঙালি জাতির পিতা। আর এখন তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার, আবার কখনো বিকৃত করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু তথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসকে কখনো মুছে ফেলা যায়নি, বঙ্গবন্ধুকে যতবার ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই তিনি আরও প্রবলভাবে সমহিমায় বাঙালির হৃদয়ে শক্ত করে স্থান করে নিয়েছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই তিনি বুঝেছিলেন, এই দেশভাগে বাঙালির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। আর যখনই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাঁয়তারা শুরু করে, তখনই বঙ্গবন্ধু প্রথম রুখে দাঁড়ান। সেই থেকে শুরু ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান ১৯৬৬

সালে তিনি যখন বাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা পেশ করেন, তখনই তিনি বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। ছয় দফা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ছয় দফা হলো স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য। তারপরই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে আটক করা হলো। দীর্ঘদিন আটকে রাখা হলো। বাংলার মানুষের দুর্বার আন্দোলনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তিলাভের পর ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতার সমাবেশে শেখ মুজিবুরকে দেওয়া হয় সংবর্ধনা। তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবে শেখ মুজিব ভূষিত হন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক, ২৪ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ব্যর্থ বৈঠক এবং ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বুলেট হামলা– এ গল্পগুলো আমাদের বেশ পরিচিত। সব আলোচনা ব্যর্থ হলে ২৫ মার্চের রাত ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন: 'This may be my last message, from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours.'

ঘোষণাপত্রটি সারা দেশে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এতটা স্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণাকে পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত করে একজন সিপাইকে ঘোষক বানানোর বিকৃত চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ তখন দেশ চলত বঙ্গবন্ধুর নামে, একমাত্র নেতা তিনিই। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজির জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সে মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গের কাছাকাছি তরঙ্গ থেকে ক্ষীণ স্বরে শেখ মুজিবুরের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করছেন।' স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবকে রাত ১টা ১০ মিনিটে তার ৩২নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন আরও শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ আর অসংখ্য ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের পরিব্যাপ্তি ছিল বাঙালি জাতিসত্তায়। বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশের মাটিতে পা রেখে সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ছুটে যান গণমানুষের সমাবেশে। কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, '... আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, মুসলমান একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলেম, যদি আমার মৃত্যু এসে থাকে, আমি হাসতে হাসতে যাব। ... তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। ... আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে। আমার বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন। বাংলার মানুষ আজ স্বাধীন।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এদেশের মানুষের ছিল আত্মার সম্পর্ক।

> বঙ্গবন্ধুকে বাংলা থেকে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বারবার বাংলার কোটি হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। দেশ-জাতি যখন সংকটে পড়ে, তখনই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, সঠিক পথ খুঁজে দেয়

বঙ্গবন্ধুকে বাংলা থেকে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বারবার বাংলার কোটি হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। দেশ-জাতি যখন সংকটে পড়ে, তখনই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, সঠিক পথ খুঁজে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথিকৃৎ এবং বাঙালি জাতির একমাত্র নেতা। বঙ্গবন্ধু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট গঠন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের সুমহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর অমর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দেশ স্বাধীনের পাঁচ দশকে মাঝে মাঝে দেশে ছন্দপতন ঘটলেও এখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথেই চলছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ স্বপ্নপূরণের পথে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক এবং অবিচ্ছেদ্য। বলা যেতে পারে, একটি মুদ্রার দুটি ভিন্ন পিঠ। বাংলার স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু চিরকালের জন্য চিরজাগ্রত। তিনি বাঙালি জাতির পিতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি অমর, তিনি অবিনশ্বর। তিনি এই স্বাধীন ভূখণ্ডের স্রষ্টা, তিনিই জাতির পথপ্রদর্শক, বাংলাদেশের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু তুমিই বাংলাদেশ। তোমার জন্মশতবর্ষে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক : সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

মো. নূর ইসলাম খান অসি

ব্রিটিশ-শাসিত একটি অবহেলিত মহকুমার নাম গোপালগঞ্জ। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) একটি অখ্যাত গ্রাম ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় টুঙ্গিপাড়া। সে গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ শেখ সায়েরা খাতুনের গর্ভে জন্ম নিলেন শিশু মুজিব। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। যিনি পরবর্তী সময়ে স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও নেতৃত্বের গুণে শিশু মুজিব থেকে মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধু, সর্বোপরি বাঙালি জাতির পিতা। তিনি শুধু বাঙালি জাতির পিতাই নন, তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত। শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, দেশবন্ধু, নেতাজি সুভাষ বোস, মওলানা ভাসানীর অনুপ্রেরণায় শেখ মুজিব স্বদেশি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রথম কাতারে উঠে এলেন। তাঁর পদচিহ্ন ধরেই ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতি এগিয়ে চলেছে। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই অবহেলিত, নির্যাতিত ও শোষিত সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠীর মর্মবাণী। তাঁর চোখে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তিমিররাত্রির অবসানে প্রতীক্ষাব্যাকুল বাঙালি জাতির কাঙ্ক্ষিত আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন। এককথায়– বাঙালি জাতিই যেন শেখ মুজিব আর শেখ মুজিবের অপর নাম বাঙালি জাতি। এমনইভাবে তিনি জাতির সত্তায়-অস্তিত্বে একাকার হয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বড়ো সার্থকতা বাঙালি জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তায় সমৃদ্ধ করা। বিশ্বের অন্য কোনো জননেতার পক্ষে যা সম্ভব হয়নি। এখানেই তিনি চিরকালের মতো ব্যতিক্রম।

১৯৪৮ সালে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, ঢাকার নবাব নাজিমুদ্দিন ও নুরুল আমীনসহ এদেশীয় দোসররা পল্টন ময়দান ও কার্জন হলে ঘোষণা দেন, 'উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' মুজিবের তারুণ্য দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদী সোচ্চার না-না। সেই

কণ্ঠের সঙ্গে হাজারও কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল, 'না-না-না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' চক্রান্তকারীরা সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অঙ্কুরেই ধ্বংস করার মানসে শুরু করল বাঙালিদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন। মুজিবের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে তৈরি হওয়া 'ভাষা সংগ্রাম কমিটি' সাংগঠনিকভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এর কর্মীরা নেতা মুজিবের অনুপ্রেরণায় সারাদেশে গড়ে তুলল দুর্বার গণআন্দোলন। গণঅসন্তোষ তখন চরম আকার ধারণ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে আমরাই রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেলাম। এর নেপথ্য নায়ক তৎকালীন উদীয়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর হলো চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। সেদিন জননেতা সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক নির্বাচনি জোট গঠিত হলো, তার প্রাণপুরুষ ও মূল চালিকাশক্তি ছিলেন শেখ মুজিব। ব্যালটের মাধ্যমে বাঙালি জাতি সেদিন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে যেভাবে উৎখাত করল, দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজির মেলা ভার।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন। উনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থান, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলাসহ প্রতিটি আন্দোলনের সফল রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালিদের পক্ষে কথা বলার অজুহাতে বারবার বঙ্গবন্ধু মুজিবের সুযোগ্য সহকর্মীদের আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করল পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। মুক্তি দিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

এতদিনে বাঙালিদের কাছে 'শেখ মুজিব' মুজিবভাই থেকে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। বাংলার আকাশে-বাতাসে শুধু মুজিবের জয়ধ্বনি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রনেতা, বুদ্ধিজীবী সবাই একত্রিত হলো। তারা বুঝতে পারল মুজিব ছাড়া এ শৃঙ্খলমুক্তির উপায় নেই। মুজিবের নেতৃত্বেই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালিদের শিখিয়েছেন দেশমাতৃকার জন্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়ানোর। গণআন্দোলনে আইয়ুব খান গদিচ্যুত হলেন। ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ভিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের। ১৯৭০ সালে দেশের সমগ্র উপকূল এলাকায় সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ বাঙালি মারা গেল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির চরম দুর্দিনে সামান্যতম সমবেদনা জানাল না। বঙ্গবন্ধু ছুটে গেলেন জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায়। আগে মানুষ বাঁচাও, পরে নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এহেন বিমাতাসুলভ আচরণ এবং বঙ্গবন্ধুর দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা বাঙালিদের আরও জোটবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করল। এবার

মুজিবের নেতৃত্বেই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালিদের শিখিয়েছেন দেশমাতৃকার জন্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়ানোর

প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছে। তাই সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নৌকা প্রতীকে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিল।

স্বৈরাচারী পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে টালবাহানা শুরু করল। মুজিব ডানে গেলে ভুট্টো-ইয়াহিয়া যায় বাঁয়ে। বাঙালিরা তখন অনেক সাহসী, অনেক বেশি সচেতন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের শিখিয়েছেন, 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার; এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার।'

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মুজিবের নির্দেশে, মুজিবের আদর্শে, মুজিবের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল বাঙালি জাতি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভুট্টো এসে মুজিবকে নানা প্রলোভনের টোপ দিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, 'বাংলার জনগণ ছয় দফা ও ১১ দফার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাদের সাথে আমি বেইমানি করতে পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না,

বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি চাই।' ইতোমধ্যে 'সোয়াত' জাহাজভর্তি অস্ত্র চট্টগ্রামে এসে পড়েছে। এলো ২৫ মার্চ কালরাত্রি। ওইদিনই রাতের আঁধারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র-নিরপরাধ বাঙালির ওপর স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজপথ হলো রক্তের নদী, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। ইতোমধ্যে সারাদেশে দেশপ্রেমিক সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, জনতা যার যা আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুকে রুখে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধুকে ধ্যানে-জ্ঞানে রেখে, তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তিসংগ্রামে। পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে পালিয়ে গিয়ে স্বল্পমেয়াদি গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলো স্বদেশ বিজয়ে। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হলো। এর প্রধান হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী জীবনমরণ সংগ্রামে, ৩০ লাখ শহিদের রক্ত আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত হারিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলার পূর্ব দিগন্তে উদিত হলো। বাঙালি জাতি আবার হাজার বছর পর একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ পেল, জাতীয় পতাকা ও সংগীত পেল; কিন্তু তার স্বপ্নদ্রষ্টাকে পেল না। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানিদের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। বাঙালির হৃদয়ে তখন কারবালার মর্শিয়া। কেউ রোজা রাখে, নফল নামাজ পড়ে, আবার কেউ ঠাকুরবাড়িতে পূজা দেয় যেন তাদের প্রিয় নেতা জীবিতাবস্থায় স্বাধীন বাংলার বুকে ফিরে আসে। বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিশ্ববাসীর চাপের মুখে বাঙালির নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ মায়ের বুকে ফিরে এলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ– কিছুই নেই। সীমাহীন অভাব ও অপরিসীম চাহিদার মধ্যে শূন্যহাতে বাংলার মসনদে বসলেন মুকুটহীন সম্রাট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিভিন্নমুখী অসুবিধার মধ্যেও তিনি যখন ধীর পদক্ষেপ শোষণমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃপ্তপ্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্র ও তাদের এদেশীয় পদলেহী মনুষ্যরূপী পশুরা মেনে নিতে পারেনি। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাঙালি জাতির পিতাই নন, বাংলাদেশের স্থপতিই নন, স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের 'মুক্তির অগ্রদূত'। সব দেশের জাতীয় ও মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্র ও তাদের এদেশীয় পদলেহী নরকের ঘৃণ্য কীটেরা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। তারই পরিণতিতে এ দেশীয় কুলাঙ্গার ঘরের শত্রু বিভীষণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দালাল নরপশু মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, মেজর ডালিম ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ২১ বছর যারাই ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন, তারা প্রতিনিয়ত রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকাসহ সব প্রচারমাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এর সর্বাধিনায়ক ও সিপাহসালাদের বিরুদ্ধে বিকৃত ইতিহাস ও কুৎসা প্রচার করে এদেশের স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ মানুষকে করেছে বিভ্রান্ত। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন পুনরায় বাংলার সিংহাসনে আসীন হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। জাতির পিতার কতিপয় হত্যাকারীর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। ২০১০ সালের ৮ নভেম্বর বাঙালি জাতির জন্য স্মরণীয় দিন, দীর্ঘ দুই যুগ পর বাঙালি জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হলো। এরপর দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা তৃতীয়, চতুর্থবার বঙ্গবন্ধুকন্যা মানবতার জননী শেখ হাসিনা 'সরকার গঠন' করেন। তাই তো বাংলার পথে-প্রান্তরে ভেসে বেড়ায় একটি কথা, 'শেখ হাসিনার হাতে যতদিন দেশ, পথ হারাবে না বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশে শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে হেমিংওয়ের এ উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করা যায়: 'Time is not made for defeat. Man can be destroyed but not defeated.' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়– 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

লেখক: পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু, ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষা

শরিফুল হাসান শিশির

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা-পর্ব থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন এবং দফায় দফায় সহ্য করেছেন জেল-জুলুম। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল আলম। এই সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা দাবি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয় এবং ধর্মঘট খুবই সফলভাবে পালিত হয়।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'। যে মুহূর্ত থেকে জিন্নাহর মুখে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে ঘোষিত হয়, সে মুহূর্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দুর্বারগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলনে।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। জেলে বন্দি অবস্থাতেই শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন এবং আন্দোলনকে সফল করার জন্য জেল থেকেই পাঠাতেন গুরুত্বপূর্ণ সব নির্দেশনা। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শেখ মুজিবুর রহমান জেলের ভেতরেই আমরণ অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট আহ্বান করে। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভাঙতে চাইলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, সফিউল। জেল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান শহিদদের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানান। তখন তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। টানা ১৩ দিন শেখ মুজিবুর

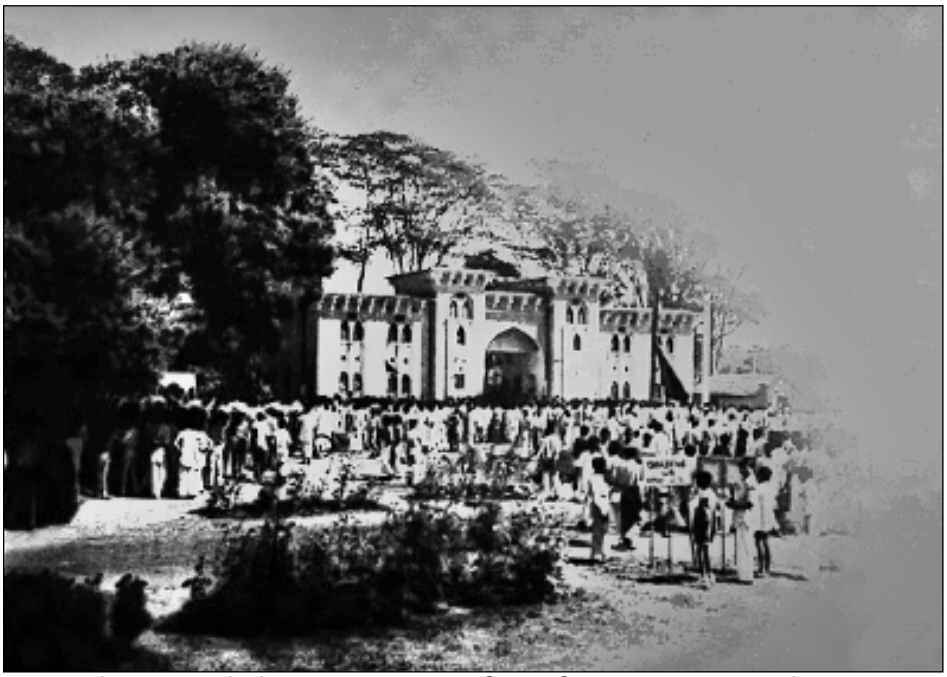

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভাষাসংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি

রহমান তাঁর অনশন চালিয়ে যান। পরে তাঁকে ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

চূড়ান্ত পর্যায়: জিন্নাহর ঢাকা ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র-যুবসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের পর ধারণা করা যাচ্ছিল, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সতর্ক ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এদিকে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ মারা গেলে খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫১ সালে আততায়ীর গুলিতে লিয়াকত আলী খান নিহত হন এবং নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সঙ্গে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও (১৫ মার্চ ১৯৪৮) নাজিমুদ্দিন তা ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। ৩০ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। এর আগে ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট এবং সভা-সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরের দিন বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শহিদ হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। এদেশের জাতীয় ইতিহাসে রচিত হলো এক রক্তাক্ত অধ্যায়। এরপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয়।

পরিশেষে: যে জাতি নিজের ভাষার জন্য প্রাণ দিল, জন্ম দিল এক রক্তাক্ত ইতিহাসের, সেই জাতিই আবার তার ভাষাকে অবজ্ঞা করছে, বিকৃত করছে– এটা দুঃখজনক। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এটাই। এছাড়া নিজেদের আধুনিক দাবি করা কিছু মানুষ আত্মগরিমায় ভুলে গেল নিজের ভাষা অর্জনের ইতিহাসটিও। এ গোষ্ঠী চর্চা শুরু করল শুধুই ইংরেজির, তাও আবার বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে। প্রায় সাত শ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল যে ভাষার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, সেই ভাষাই বিকৃত হতে শুরু করল স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে এসে।

ইংরেজি মাধ্যমে পড়া নিজের সন্তানটি প্রমিত বাংলায় কথা বলতে জানে না যখন, এটাই যেন মা-বাবার জন্য গর্বের। অতি সম্প্রতি এ দেশে আবার হিন্দিচর্চাও শুরু করেছে তাদের কেউ কেউ। ইংরেজি ভাষা শেখা বা বলাটা অন্যায় নয়; কিন্তু বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে শেখা বা মিশিয়ে বলতে গিয়ে 'বাংলিশ' করে বলাটা অন্যায়। তাই বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। বাংলা ভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে গভীর অনুরাগ, সেই অনুরাগ বুকে লালন করে তরুণ সমাজকে নেতৃত্ব দিতে হবে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক বাংলা ভাষা। বাস্তবায়িত হোক সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন।

লেখক: সার্জেন্ট, এসএমপি

৭ মার্চের ভাষণ

বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মহাকাব্য

মো. আজিজুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই। তিনি লিখেছেন, '৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর অমর রচনা, বাঙালির মহাকাব্য। এ মহাকাব্য বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের ধারা ও স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এ মহাকাব্য রচনা সম্ভব ছিল।' ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ১৮ মিনিটের অনলবর্ষী ভাষণে এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। যে মহাকাব্যের মধ্যে নিহিত হয়েছে বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ভাষণের শব্দশৈলী ও বাক্যবিন্যাসে তা হয়ে ওঠে গীতিময় ও শ্রবণের চতুর্দিকে অনুরণিত। যে কারণে মার্কিন ম্যাগাজিন Newsweek বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দিয়েছে 'Poet of Politics' হিসেবে। এদেশের কোটি জনতার বহু যুগের লালিত স্বপ্ন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রামের ফসল আমাদের এই মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্রে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভাষাভিত্তিক একমাত্র জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। হাজার বছরের সংগ্রাম শেষে যে রাষ্ট্রের বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি, বিত্তবৈভবের বিভাজন নির্বিশেষে এক মহা ঐক্যে জাগ্রত করেছিলেন এক মহাভাষণের মাধ্যমে। এই মহাভাষণের পটভূমি তিনিই তৈরি করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮– দীর্ঘ দুই দশকে তিনি যে অসংখ্যবার বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য জেলে গিয়েছেন, তা বাঙালি-মননে অগ্নিশিখার মতো কাজ করেছিল। ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের একটি পরিণত ফুল ও ফল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। যে ঘোষণার সূত্র ধরে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে নিজস্ব অবস্থানের চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায় 'বাংলাদেশ' নামে ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র। একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে যাতে চিহ্নিত না হন, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সব সময় সতর্ক ছিলেন। নিজেকে এবং বাঙালিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার লক্ষ্যে নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে Newsweek ম্যাগাজিনের বর্ণনা নিম্নরূপ:

> "A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence, Mujib privately told Newsweek's Loren Jenkins that, 'there is no hope of salvaging the situation. The country as we know it is finished.' But he waited for President Yahya Khan to make the break. 'We are the majority so we cannot secede. They, the westerners, are the minority, and it is up to them to secede."

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে কৌশলী পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাতে বিশ্বের সেরা সমর-কৌশলীরাও অবাক হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের ইতিহাসের দায় মোচন করেছিলেন অবিস্মরণীয় এক ভাষণের মধ্য দিয়ে। তিনি অবিশ্বাস্যভাবে মুক্তিপথে সংহত করে দাঁড় করিয়ে দিলেন বাংলার মানুষকে, যার ফলে সামনের দিনগুলোয় যা-ই ঘটুক না কেন, অনন্যদৃঢ়তায় ঐক্যবদ্ধ জাতি তা মোকাবিলায় হয়ে উঠেছিল ক্ষমতাবান।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। গ্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোনাল্ড রিগ্যান পর্যন্ত ২৫০০ বছরের বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী ৪১ জন সামরিক-বেসামরিক জাতীয় বীরের বিখ্যাত ভাষণ নিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F field, 'We shall Fight on the Beaches: The Speeches That Inspired History' শিরোনামে একটি বই লিখেন। যে বইটি ২০১৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ওই বইয়ে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সিজার, অলিভার ক্রমওয়েল, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, জোসেফ গ্যারিবোল্ডি, আব্রাহাম লিংকন, ভ্লাদিমির লেনিন, উইন্ড্রো উইলসন, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, উইনস্টন চার্চিল, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, চার্লস দ্য গল, মাও সেতুং, হো চি মিন প্রমুখের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে কৌশলী পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাতে বিশ্বের সেরা সমর-কৌশলীরাও অবাক হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের ইতিহাসের দায় মোচন করেছিলেন অবিস্মরণীয় এক ভাষণের মধ্য দিয়ে

বিশ্ব ইতিহাসে যে কটি অসাধারণ বক্তৃতা আছে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রায় ১০ লাখ মানুষের সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা তার অন্যতম, শ্রেষ্ঠতম। আর কোনো স্মরণীয় ভাষণের বক্তা এরকম একটি বিশাল জনসমুদ্রে তাৎক্ষণিক শব্দচয়নের মাধ্যমে এমন একটি মহাকাব্যিক ভাষণ দেননি। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পিতা ফিলিপের হাতে যখন একে একে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটছিল, তখন ডেমোস্থেনিস নগররাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের স্বাধীনতা হারানোর অশনিসংকেত নির্দেশ করে যে ভাষণগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় ভাষণ। সেসব ভাষণের বিভিন্ন অংশ কালের সীমানা পেরিয়ে আজও আমাদের উদ্দীপ্ত করে। খ্রিষ্টজন্মের ৪০০ বছর আগে অ্যাথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ৩০ বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছিল, তা পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। সে যুদ্ধের একপর্যায়ে এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস যে অবিস্মরণীয়ও মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা আজও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চিরন্তন বাণী হিসেবে ইতিহাসকে আলোকিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ

অধিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৩ সালের আগস্টে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' (I have a dream) শিরোনামে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা-ও বিশ্ব ইতিহাসের একটি অমর বক্তৃতা। পেরিক্লিস, আব্রাহাম লিংকন এবং অন্যান্য মহান জাতীয় নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, তা কোনো জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে নয়। সেসব ভাষণে কোনো একটা জাতিকে হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং মুক্তিসংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণে বাঙালি যেন হাজার বছরের জড়তা, দৈন্য ও গ্লানি অতিক্রম করে এক মহাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজন্ম সাধন-ধন, আজন্ম অধরা স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার দীক্ষা পেল। ইতিহাস বড়ো নির্মম, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের মুক্তি যারা চেয়েছেন, স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁদের কখনোই ক্ষমা করেনি। ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং ও বঙ্গবন্ধু। আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছিলেন ডেমোস্থেনিস। স্বাভাবিক মৃত্যু পেয়েছিলেন কেবল পেরিক্লিস।

অধ্যাপক অজয় রায় ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, 'মন বলছিল আজ বাংলার-বাঙালির এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় রচিত হবে। ইতিহাস রচনার এই মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত থাকা হাজার বছরে একবারই আসে। কাজেই সেদিন এই ময়দানে উপস্থিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা অনেকের চাইতে ভাগ্যবান, তাঁরা জননন্দিত নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে ইতিহাস রচনায় অংশ নিয়েছিলেন, আর ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক অমর কাব্যখানি লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং, যে কাব্যের নাম 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

৭ মার্চের ভাষণ কোনো তৈরি করা বক্তৃতা নয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি চেতনায় প্রস্ফুটিত হয়ে হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। অতিকথন নেই, পুনরুক্তি নেই, হোঁচট খাওয়া নেই, নেই কোনো থামাথামি। গণমানুষের ইচ্ছা ও সাহসের ওপর ভর করে তিনি বলেছেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল– প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এর চেয়েও তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল– 'এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে– খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো।'

এই ভাষণের জন্যই হয়তো বাঙালি সহস্র বছর অপেক্ষা করেছে। ৭ মার্চের ভাষণ শোনার জন্য শহীদুল্লা কায়সার ও পান্না কায়সারের প্রস্তুতি তা-ই বলে। 'মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে' গ্রন্থে পান্না কায়সার লিখেছেন, 'শহীদুল্লা কায়সার তাকে বলেন, তোমার জীবদ্দশায় এমন ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হবে না। চল, কিছুক্ষণ থেকে চলে এসো। আমার ছেলে তার জন্মের আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবে। তোমার জীবনে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

কথাসাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাইয়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। তিনি ৭ মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বহু বছর হলো ১৯৭১-এর ৭ মার্চ অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এখনো বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তৃতা যখন শোনা যায়, শ্রোতার প্রতিটি রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়, আবেগে উদ্বেলিত হয় মন এবং প্রবল শক্তিরত জেগে ওঠে সকল চেতনা। কথামালার এই অবিনশ্বরতা আর কোনো বক্তৃতায় রয়েছে বলে জানা নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার, যার গৌরব অনুভূত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।'

লেখক: প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি কালাচাঁদপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, গুলশান, ঢাকা

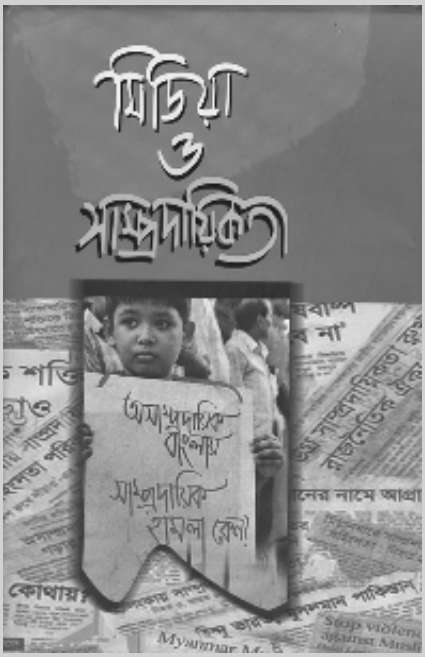

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তৃতীয় বিশ্ব উত্তরণে বঙ্গবন্ধুর চেতনা

শাহ্ সোহাগ ফকির

সোনার বাংলাদেশকে বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের দীপ্ত মেধাকে কাজে লাগাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞা ও মন্ত্রই বড়ো নিয়ামক। তিনি উজ্জীবিত করে গেছেন বাংলার তরুণসমাজকে। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, সাহসিকতা, দূরদর্শিতায় দীক্ষিত বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ যে ঈর্ষণীয় অগ্রযাত্রায় এগিয়ে গেছে– এর পেছনে তরুণদের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞাই অনুপ্রাণিত করেছে তরুণদের। আর সেই মন্ত্র বুকে লালন করে তরুণদের হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাযাত্রায়। বাংলাদেশ নতুন পরিচয়ে পরিচিত এখন বিশ্বদরবারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তিতে অবাক হয়েছে বিশ্ব। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের নিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কম পুঁজিতে কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। কিন্তু জাতির বুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো অধ্যায় বাংলাদেশের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ম্লান করে দেয় বাঙালিদের মুখের হাসি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রচিত হয় বাংলার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার কবর। দীর্ঘ ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধের আদর্শহীন শক্তি ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নের রশিকে পেছনে টানতে থাকে। তারা ক্ষমতার লোভে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। টেলিভিশন, রেডিও এবং পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে মুছে ফেলা হয় বঙ্গবন্ধু নামটা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্যের অন্যতম একটি ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি। যদি ১৫ আগস্টের কালরাত্রি না আসত তবে হয়তো তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি বাঙালিকে দিয়ে যেতেন। তাঁর সেই

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে তরুণরা এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের বিপ্লবে। এই বিপ্লব দেখে বিশ্ব অবাক চেয়ে আছে। বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে আজ হানাদারের রাষ্ট্র পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে। তরুণ জনবল রফতানি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৭৯৬.৪৬ বিলিয়ন টাকা রেমিট্যান্স অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আজ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হয়েছে। পোশাক রফতানিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের পাশাপাশি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গড় আয়ু ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি হয়েছে; যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে দ্রুত বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ সোনায় পরিণত হতে চলেছে দুর্বার গতিতে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় দেশ আজ ডিজিটালে পরিণত হয়েছে। যার ছোঁয়া গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। জন্মনিবন্ধন, ভোটার স্মার্টকার্ড, ই-পাসপোর্ট, ই-তথ্য সেবাসহ জরুরি জাতীয় সেবা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স পেতে ৯৯৯, দুর্নীতি দমনে ১০৬, বিভিন্ন সরকারি সেবা ৩৩৩, কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে ১০৯, সুখী পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭ ইত্যাদি নম্বরের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে যাচ্ছে। তরুণদের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীড়া ক্ষেত্র। ক্রীড়ায় অভাবনীয় সাফল্যে সোনার বাংলাদেশ আজ বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হুংকার। বিশ্ব যেখানে সাম্প্রদায়িকতার নোংরা রাজনীতিতে বলি হয়ে বিধ্বস্ত, যুদ্ধের দামামায় ও আশঙ্কায় মানবজাতি হুমকির পথে– সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে সব সম্প্রদায়ের মানুষ আজ সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে এসেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

তরুণসমাজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু ভালোবাসার স্থান নয়, তিনি তরুণ প্রজন্মের একটি আদর্শ; একটি পাঠ্যপুস্তকই নয়, বরং একটি লাইব্রেরি বলা চলে। যিনি শিখিয়েছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণে। শ্যামল-সুন্দর এই সোনার বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তরুণ প্রজন্ম কাঁধে নিয়েছে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো। আউটসোর্সিং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম। যার মাধ্যমে ঘরে বসে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে কাজে লাগাতে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক নির্মাণসহ আরও উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির প্রকল্পের নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখবে। কমবে বেকারত্ব নামের অভিশাপ। সবার মুখে ফুটবে সোনার হাসি। সে হাসি দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৃতীয় বিশ্ব উত্তরণে সোনার বাংলাদেশ ডিজিটাল পরশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা তরুণদের আরও উজ্জীবিত করবে। অচিরেই দেশ এগিয়ে যাবে অনেক মধ্যম আয়ের দেশকে পেছনে ফেলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন। সবাইকে স্বাধীনতার স্বাদ বোঝাতে পেরেছিলেন। নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে একখণ্ড স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন বলেই ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ জীবন, রক্ত আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের ত্যাগে আমরা পেয়েছি এই বাংলাদেশ। সেভাবেই আমরা তার দেখানো স্বপ্নকে চেতনা হিসেবে নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব। তখন বাংলাদেশ আর জনশক্তি রফতানি করবে না বরং আমদানি করবে। সেসময় হয়তো আর দূরে নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো স্বপ্নে যেভাবে জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি, সেভাবেই তরুণরা মেধা দিয়ে দেশের ভাগ্য বদলে দেওয়ার যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করতেই পারি। কারণ, আমরা বীরের জাতি। আমাদের আছে ১৯৫২, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের মতো গর্বের ইতিহাস। আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো স্বপ্ন। আছে তাঁর রেখে যাওয়া প্রজ্ঞা। তাঁর চেতনায় আগামী দিনের পথগুলো পাড়ি দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করাই তরুণদের দৃঢ়প্রত্যয়।

এই বিশ্বায়নের যুগে অন্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব প্রতিযোগিতায় টিকে তরুণরা মেধা দিয়ে ক্রমবর্ধমান স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে, তা বিস্ময়ের বিষয়। তরুণসমাজ দেশে ও দেশের বাইরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তিতে যে অবদান রেখে চলেছে, তা প্রশংসার দাবিদার। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক বেকার তরুণ আছে, যাদের আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও বিভিন্ন সংগঠনের ওপর বর্তায়। তরুণদের বর্তমান সময়ের মাদক নামের মহামারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই স্বাধীনতা-পরবর্তী বড়ো যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হেরে গেলে ম্লান হবে আমাদের স্বাধীনতার প্রত্যাশা। ভূলুণ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো স্বপ্ন। সরকার মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা প্রশংসার দাবিদার। তবে তা অব্যাহত না রাখলে সোনার বাংলাদেশ গড়তে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য তরুণদের মাদক ও দুর্নীতিবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দীক্ষা বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন, তা কাজে লাগাতে পারলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত শিখরে পৌঁছে যাব। দেশের সার্বিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের দীপ্ত মেধা ও শ্রম অচিরে বাংলাদেশকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে ঘটাবে উত্তরণ। যার হাতিয়ার হতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা। আগামী দিনের বিশ্বে পদার্পণ করতে তরুণসমাজ সে পথে এগিয়ে যাবে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, চেতনা এবং অসমাপ্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও উন্নত দেশ গড়তে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার মানসে তরুণরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

লেখক: নাট্যকার ও গীতিকার

আপসহীন বঙ্গবন্ধু

সোহেল রানা

বাঙালি সভ্যতার আধুনিক স্থপতি, যাঁর জীবনের সবটুকু সময় ব্যয় করেছেন বাঙালির অধিকার আদায় তথা কল্যাণে। যিনি ২৩ বছরের নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত অসহায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। যাঁর এক ডাকে জড়ো হতো ৭ কোটি বাঙালি। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামে যিনি সরাসরি নেতৃত্ব দিতেন, যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো না। যাকে বাঙালি ছাত্রসমাজ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছে। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির জাতির পিতা। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। অন্যায় দেখলে আপস করতেন না। পাকিস্তানিরা তাঁকে দমাতে চেয়েছিল। হত্যাও করতে চেয়েছিল। বছরের পর বছর অন্যায়ভাবে তাঁকে জেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুর কাছেই তিনি মাথা নত করেননি। তিনি ভালোবাসতেন দেশের মানুষকে। আবার দেশের মানুষও ভালোবাসত তাঁকে। তাঁর শক্তির উৎস হচ্ছে বাঙালির প্রতি ভালোবাসা ও আপসহীনতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যে কোনোদিন তাঁকে ফাঁসি দিতে পারত পাকিস্তানি শাসকরা। এমনকি কবর খোঁড়াও হয়েছিল তাঁর সেলের সামনে। নির্ভীক বঙ্গবন্ধু সেই কবর দেখে বলেছিলেন, 'আমি তো জানি তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। বাংলার দামাল ছেলেরা যখন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে শিখেছে, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই দমিয়ে রাখে। তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা আমাকে এই কবরে কবর দিও না, আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।' বঙ্গবন্ধু জানতেন, বাংলার মানুষ এ দেশকে স্বাধীন করতে পারবেই। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুরও প্রাণ দিতে আপত্তি ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর আপসহীনতার কারণ হলো জনগণের অধিকার। সাধারণ মানুষের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপস ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি জানতেন যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হবেন। কিন্তু পালিয়ে যাননি। পালায় কাপুরুষ, ভিরুর দল। বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের আস্থা শতভাগ ঠিক ছিল। জনগণকে রেখে সত্যিকারের নেতা পালাতে পারে না। এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। বঙ্গবন্ধু চাইলে পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আপস করে আরাম-আয়েশের জীবন বেছে নিতে পারতেন। তাঁর কাছে বরং জেলজীবন এর চেয়ে উত্তম মনে হয়েছে। জনগণের প্রতি ভালোবাসা এ সবকিছুর কারণ। তাই জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি আমৃত্যু ছিলেন আপসহীন।

'পাখি উড়ে গেছে'– ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে লন্ডনের উদ্দেশে একটি চার্টার্ড বিমানে উঠিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এক রহস্যময় বার্তায় এ কথাটি বলেছিলেন। জুলুমবাজ ভুট্টো শান্তি ও মুক্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধুকে কোন ধরনের পাখির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তা বিস্ময়! পাকিস্তানি এই শাসক যে মানসিকতা নিয়েই বাঙালি জাতির পিতাকে 'পাখি' হিসেবে মূল্যায়ন করুক না কেন, বাঙালি ও বিশ্ব মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে শান্তির 'শ্বেত পায়রা' বলেই মেনে নিয়েছেন। সেই মানবতা ও মুক্তির মুক্তপাখি বঙ্গবন্ধু।

১০ জানুয়ারি। বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণ। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর প্রিয়ভূমি স্বাধীন স্বদেশে মহাপ্রতাপে প্রত্যাবর্তন করেন। বীরের বেশে মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগমন ঘটে নিজ মাতৃভূমি প্রিয় স্বাধীন দেশে। তাই ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর বিশ্বনেতাদের চাপের মুখে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লন্ডন-দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় পৌঁছান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি বিমানবন্দরে কখন অবতরণ করবে, সে অপেক্ষায় পুরো বিমানবন্দর এলাকা যেন পরিণত হয় এক মহামিলনমেলায়। স্বাধীন দেশের মাটিতে পা স্পর্শ করবেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সে আনন্দে মাতোয়ারা প্রতিটি পথ-প্রান্তরে অপেক্ষমাণ কোটি বাঙালি। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিজয়ীবেশে পা রাখলেন লাখো শহিদের রক্তে রঞ্জিত স্বাধীন বাংলার মাটিতে। পুরো বঙ্গরাজ্য 'জয় বাংলা' স্লোগানে স্বাগত জানায় তাঁদের প্রিয় নেতাকে। প্রিয়ভূমের মৃত্তিকাবক্ষে পা রেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যার সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মঞ্চে বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, তবুও এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।' তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেই ফিরেছেন স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ডে। আপনভূমে পা রাখার কিছুদিন পর ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রকাশিত নিউজ উইকের এক নিবন্ধে বলা হয়, পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ওইদিন মধ্যরাতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে মুজিবকে (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) সঙ্গে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দরে যান এবং একটি চার্টার্ড বিমানে উঠিয়ে দেন। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও গন্তব্য নিয়ে ভুট্টো ব্যক্তিগতভাবে তাঁর (বঙ্গবন্ধু) সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। 'মুজিব ফ্লাইস টু ফ্রিডম' শিরোনামের নিবন্ধে বলা হয়, মুজিবকে বহনকারী বিমানটি হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এ সময় ৫১ বছর বয়সি এই বাঙালি নেতাকে বিশ্ববাসী প্রথম দেখল, যাকে গত বসন্তকালে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. ইয়াহিয়া খান কারাগারে পাঠায়। লন্ডনের সবচেয়ে অভিজাত হোটেল ক্লারিজে এক সংবাদ সম্মেলনে ক্লান্ত বঙ্গবন্ধু আবেগের সঙ্গে পাকিস্তানের কারাগারে তার দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমি কারাগারের কনডেম সেলে ফাঁসির অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। কারাগারে যাওয়ার দিন থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম না, জীবিত থাকব কি থাকব না। আমি মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।' টাইম ম্যাগাজিনে ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রকাশিত 'মুজিব'স রোড ফ্রম প্রিজন টু পাওয়ার' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ঢাকায় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা।' রাজনৈতিক কবি, মুক্তির কবি, স্বাধীনতার কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই কথাগুলো বাঙালি চেতনায় নতুনভাবে আশার সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছিল সেদিন। সুখী ও সমৃদ্ধিশালী একটি বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশ পরিচালনায় নিজেকে মেলে ধরার আগেই এ দেশীয় কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে স্বাধীন বাংলার স্থপতিকে। স্তব্ধ হয় পুরো জাতি। ডুকরে কেঁদে ওঠে বাঙালি-বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনিও বাবার মতোই আপসহীন। তাঁরও শক্তির একমাত্র উৎস দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে ঢুকতে না দেওয়া, একাধিকবার হত্যাচেষ্টা, ২১ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা, যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ইত্যাদি ঘটনার কোনো কিছুই তাঁর চলার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। তাঁকে ভীত করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন; কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়া তাঁর হয়নি। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছি। বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও মাথা পেতে নেব। দেশপ্রেম তাঁর সব কাজের প্রেরণা।' একমাত্র বঙ্গবন্ধুকন্যার পক্ষেই এমনটা বলা সম্ভব। আমরা গর্বিত আমাদের দেশে একজন বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে। আমাদের আছেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা। আমরা আরও গর্বিত, বাংলাদেশে মুজিববর্ষ চলছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

লেখক: সাংবাদিক

চেতনায় যা ধারণ করতে হবে

রাশেদ রাব্বি

জাতির পিতা বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারুণ্যের অহংকার। শুধু বাংলার তরুণদের নয়, বিশ্বের তরুণসমাজের জন্যও তিনি অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। তাই তো তিনি বিশ্ববন্ধু। বাঙালির চেতনায় ও অস্তিত্বে, জলে ও মাটিতে মিশে আছেন তিনি। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের তরুণ ও যুবসমাজ তাঁকে কতটা ধারণ করতে পারছে, সেটি বিচার্য। কেননা তরুণসমাজ যদি তাঁকে সঠিকভাবে ধারণ করতে না পারে, তাহলে এই বাংলাকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করা সহজসাধ্য হবে না।

বাঙালির স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। আসছে ১৭ মার্চ তাঁর জন্মের শতবর্ষ। বর্তমান সরকার দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ খ্রিষ্টাব্দকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৯৬টি পরিকল্পনার সমন্বয়ে মহাপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। সেটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার ও সংশ্লিষ্টদের।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রয়াত নিয়ামত হোসেন তার কিশোর বয়সে দেখা বঙ্গবন্ধুর একটি অস্পষ্ট বর্ণনা করেন লেখকের সঙ্গে। ঘটনাটি দেশভাগের সময়কার। কিশোর নিয়ামত হোসেন উঠে বসেছেন গোয়ালন্দ থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে। সময় হলেও ট্রেন ছাড়তে দেরি করছে। হেতু বোধগম্য নয়। এমন সময় সদলবলে ডানপিটে এক যুবক ট্রেনের কামরায় কামরায় যাত্রীদের মালপত্র খুঁজে দেখছেন কেউ এদেশের কোনো মূল্যবান সম্পদ ওপারে পাচার করছে কিনা। দেশের কোনো মাল তিনি পাচার হতে দেবেন না। সেদিনের ওই ডানপিটে দেশপ্রেমিক যুবকই পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত

হন। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন বাঙালির নয়নমণি, টুঙ্গিপাড়ার খোকা থেকে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু বর্তমান তরুণ, যুবকরা বঙ্গবন্ধুকে এভাবে ধারণ করতে শিখেছে কি? তারা অনুধাবন করতে পেরেছে কি দেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি নির্মোহ আত্মিক সম্পর্কের বন্ধন। না, তারা পারেনি। কারণ বর্তমান যুবক ও তরুণসমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই– এদের মধ্যে একটি শ্রেণি হতাশায় নিমজ্জিত। একটি শ্রেণি মুখে বঙ্গবন্ধুর নাম নিলেও তাদের কৃতকর্ম বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। আরেক শ্রেণি বঙ্গবন্ধুর নামেই করছে নানা অপকর্ম। তবে এই দোষ শুধু এই তরুণ-যুবকদের দিলেই হবে না। এই দোষের বড়ো অংশ তাদের, যারা বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে তরুণদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। যারা বঙ্গবন্ধুকে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছে। যারা এখনো বঙ্গবন্ধুকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

তরুণসমাজের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, সঠিক প্রতিবিম্ব তুলে ধরার দায়িত্ব তাদের, যারা নিজেদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক সৈনিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। যারা নিজেদের বঙ্গবন্ধুর ধারক-বাহক হিসেবে পরিচয় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যক্তিস্বার্থে তারাই আবার বঙ্গবন্ধুকে আড়ালে রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে দেশের তরুণসমাজকে এই শ্রেণির ছায়াতল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে উন্মুক্ত করতে হবে তারই সৃষ্ট অসীমতায়। বঙ্গবন্ধুর আকাশ থেকে সরাতে হবে কালো মেঘের অবগুণ্ঠন। তিনি আমাদের পরিচয়, তিনিই আমাদের অস্তিত্ব। তিনিই আমাদের আস্থা ও নির্ভরতরা প্রতীক। তরুণসমাজকে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই স্থানে পরিপূর্ণতায় স্থাপন করতে হবে।

তরুণসমাজকে এখন শপথ নিতে হবে– এই মুজিববর্ষে দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। সেখনে থাকবে না শিশুশ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি। যেখানে থাকবে না সাম্প্রদায়িকতা, থাকবে না কোনো বেকারত্ব। সড়ক দুর্ঘটনায় হারাবে না কোনো প্রাণ। মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটবে, বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন। পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ হবে, রক্ষা পাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ সার্থক হবে। সৃষ্টি হবে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

লেখক: সিনিয়র রিপোর্টার, যুগান্তর

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সংগীত অনুরাগী বঙ্গবন্ধু

বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিমান একজন মানুষ ছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' পড়লে তাঁর ভেতরকার সংস্কৃতি ভাবসম্পন্ন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি একাধারে যেমন গান পছন্দ করতেন, তেমনি কবিতাও। তাঁর প্রিয় গান কোনটি, এটা বলা বেশ মুশকিল। তবে তিনি সংগীতানুরাগী একজন মানুষ ছিলেন।

আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান ও নজরুলের কবিতা তাঁর কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে, আব্বাসউদ্দীনের গান ছিল তাঁর অতি প্রিয়।' অন্যপ্রকাশ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের নির্বাচিত প্রবন্ধের মধ্যে 'ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান' লেখায় তিনি লিখেছেন, "১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ। এর দুবছর পর তাঁর জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়া জানাচ্ছেন, একদিন রাতে সপরিবারে খাবার খেতে খেতে শেখ মুজিব বলেছিলেন– 'দেশটা যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তাহলে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করো।" (পৃ. ১২৪)

প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৯ সালে প্রকাশিত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের লেখা 'এই পথে আলো জ্বেলে' বইয়ে তিনি লিখেছেন, "সেদিন রাত সাড়ে আটটা। রেডিও পাকিস্তানে তখন গজল পরিবেশিত হওয়ার কথা। এই সময় সাধারণত উর্দু গজল বাজানো হয়ে থাকে। হঠাৎই ঘোষণা শোনা গেল, এখন শুনবেন দুটো রবীন্দ্রসংগীত।

রেডিও পাকিস্তানে বেজে উঠল:

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥'

এরপর বাজল:

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ির দোতলায় ১২ বছরের রেহানা একলা একলা বসে রেডিওর নব ঘোরাচ্ছিল। সে হঠাৎই রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পেয়ে মাকে ডাকতে গেল। তাঁরা তিনজন– হাসিনা, রেহানা, কামাল– তিনজনই ছায়ানটের ছাত্র। তাঁরা অন্যান্য গান ও যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও শেখেন। মোনায়েম খান যে রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত বাজানো বন্ধ করে দিয়েছে, এটা রেহানা জানে। ছায়ানটেও এই নিয়ে তাঁদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কথা বলেছেন। আর তাঁদের আব্বা যে রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা খুবই পছন্দ করেন, এটাও তার অজানা নয়। বিশেষ করে 'আমার সোনার বাংলা' গানটা আব্বার খুবই প্রিয়। রেহানা তিন সিঁড়ি করে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে মায়ের হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

রেণু বললেন, 'কী!'

রেহানা বলল, 'শোনো, আজকে আব্বা এসেছে, আর রেডিওতে কী গান বাজছে, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

রেণু রেডিওর পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে হলুদ, তেল লেগে আছে। নিচে চুলায় রান্না উঠেছে। কত মানুষ না জানি আজ রাতে খাবে! সময় কই তাঁর? তিনি তবু গান শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মনে হলো, দুই-তিন রাত আগেও মানুষটা ছিল মৃত্যুর মুখে। আর তাঁকে জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চিত দোলাচলে রেখেও তিনি, তাঁর দুই মেয়ে রেহানা আর হাসিনা বারবার বলছিলেন, 'প্যারোলে মুক্তি নিয়া আসবা না। আসলে বাড়িতে ঢুকতে দিব না।'

রেডিওতে গান হচ্ছে:

'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

রেণু চোখের জল মুছতে পারছেন না। হাতে তেল-হলুদ-মরিচ বাটা লেগে আছে। চোখ মুছলে চোখ জ্বালা করবে। বরং জল ঝরুক। অশ্রুর প্লাবন মুছে দিক বুকের ভেতর জমে থাকা যত কষ্ট!" (পৃ. ২৩১-২৩২)

এই গানটি সম্পর্কে আরও জানা যায় পরে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরেছেন। সেদিন সেই বিমানে লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হয়েছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জি। শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জির সেই অভিজ্ঞতা তিনি বই আকারে প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম: 'A Long Journey Together- India, Pakistan and Bangladesh'. এই বইয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শেখর ব্যানার্জির কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথা উঠে আসে।

> বঙ্গবন্ধু জানালা দিয়ে শ্বেতশুভ্র সাদা মেঘের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তাঁর চোখ ভরে উঠেছে জলে

বঙ্গবন্ধু জানালা দিয়ে শ্বেতশুভ্র সাদা মেঘের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তাঁর চোখ ভরে উঠেছে জলে। তিনি বললেন, 'ব্যানার্জি, আপনিও ধরুন। রিহার্সেল দিয়ে নিই।' তাঁরা দুজনে মিলে গানটা গাইলেন।

শশাঙ্ককে অবাক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ গানটি হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। কেমন হবে বলেন তো?' শশাঙ্ক জবাব দিলেন, 'ইতিহাসে তাহলে প্রথমবারের মতো দুটি দেশের জাতীয় সংগীতের লেখক হবেন একই ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বঙ্গবন্ধুর গানবিষয়ক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার সোনার

বাংলা' গানটি ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি প্রিয় গান। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গানটি গাইতে বলতেন। তিনি নিজেও অনেক সময় গুণগুণ করে গানটি গেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকের স্মৃতিকথায় এর উল্লেখ আছে।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটি কেমন করে আমাদের জাতীয় সংগীত হলো, এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বলেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আমি যখন শেষবারের মতো জনসভা করি, যেখানে ১০ লাখ লোক হাজির হয়েছিল আর 'স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা' স্লোগান দিচ্ছিল, তখন ছেলেরা গানটা গাইতে শুরু করে। আমরা সবাই, ১০ লাখ লোক দাঁড়িয়ে গানটাকে শ্রদ্ধা জানাই। তখনই আমরা আমাদের বর্তমান জাতীয় সংগীতকে গ্রহণ করে নিই।'

তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গাওয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

'আমার সোনার বাংলা' গানটি গীতবিতানের স্বদেশ পর্বে অন্তর্ভুক্ত একটি গান। এর চরণসংখ্যা ২৫। জাতীয় সংগীত হিসেবে কোনো দ্বিরুক্তি ছাড়া 'আমার সোনার বাংলা' থেকে 'আমি নয়ন জলে ভাসি' পর্যন্ত প্রথম ১০ চরণ গাওয়া হয়। প্রথম চার চরণের যন্ত্রসংগীত বাজানো হয় বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে।

২০১৮ সালে তৃণলতা প্রকাশ থেকে প্রকাশিত লেখক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপম হায়াৎ-এর 'বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য' বইয়ের 'বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবিতা ও গান' লেখা থেকে জানা যায়, "বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা ও গানের লাইন মুখস্থ ছিল। তিনি তাঁর নান্দনিকবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে অনুমোদন করেছিলেন। আবার একই বোধ থেকে তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'চল চল চল' গানটি বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর আরেকটি প্রিয় গান ছিল। তা হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত দেশাত্মবোধক গান 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।"

এসব গানের বাইরে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি প্রিয় গানের কথা জানা যায় পিপলু আর খান পরিচালিত 'Hasina: A Daughter's Tale (2018)' চলচ্চিত্রে। এই চলচ্চিত্র থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু যখন করাচি থেকে দেশে ফিরেছেন তখন পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া 'মা, আমার সাধ না মিটিলো, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা' শ্যামা সংগীতটি তিনি বারবার শুনছিলেন।

এসব আলোচনা থেকে বঙ্গবন্ধুর গানের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

তথ্যসূত্র

১. রহমান (২০১২), শেখ মুজিবুর, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১২।
২. হক (২০১৯), আনিসুল, এই পথে আলো জ্বেলে, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৯।
৩. মামুন (২০০৫), মুনতাসীর, নির্বাচিত প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৫।
৪. হায়াৎ (২০১৮), অনুপম, বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য, তৃণলতা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮।
৫. Banerjee (2008), Sashanka S., A Long Journey Together-India, Pakistan and Bangladesh, BookSurge Publishing, United States, 15 October 2008.
৬. Khan (2018), Piplu, Film: Hasina: A Daughter's Tale, Producer: Centre for Research and Information; Applebox Films, 16 November 2018 (Bangladesh).
৭. রহমান (২০১৫), আশীষ-উর, জাতীয় সংগীত মা-মাতৃভূমির অনন্য বন্দনা, প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৫।
৮. মাহমুদ (২০১৮), আবদুল্লাহ ইবনে, বঙ্গবন্ধুকন্যার হৃদয়ছোঁয়া গল্প, রোর বাংলা, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮।
৯. দাশ (২০১৪), উজ্জ্বল, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৩ ঘণ্টা, প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০১৪।

লেখক: সাংবাদিক

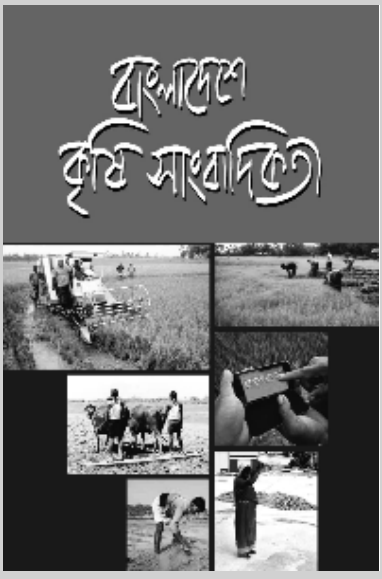

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি দূরদর্শী নেতৃত্ব

অনয় মুখার্জী

আমি স্বাধীন দেশের একজন সচেতন তরুণ। রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পরে আমার জন্ম। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশের আমি নাগরিকও বটে। আমার প্রাণপ্রিয় দেশের নাম বাংলাদেশ, যা আজ বিশ্বের অনেক উন্নয়নকামী দেশের কাছে রোল মডেল। বাংলাদেশ, আহা বাংলাদেশ– এই বাংলাদেশের এবং বাঙালি জাতির যা কিছু অর্জন, তার মূলে রয়েছেন হিমালয়সম একজন অসাধারণ নেতা। তিনি আর কেউ নন, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি অপরিসীম ত্যাগ, কঠিনতর সংগ্রাম, দূরদর্শী নেতৃত্ব, অসামান্য প্রজ্ঞা এবং সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীন করেছেন আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে এবং মুক্ত করেছেন একটি পরাধীন জাতিকে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য মৃত্যুকে পরোয়া না করে বারবার বাজি রেখেছেন নিজের জীবনকে। তাঁর হাত ধরেই ১৯৭১ সালে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের নামে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় ঘটে।

নতুন প্রজন্মের একজন নাগরিক হিসেবে মুজিববর্ষে গভীর শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় পিতার প্রতি, যিনি বাঙালির প্রাণের স্পন্দন শতভাগ অনুভব করে হয়েছেন স্বপ্নদ্রষ্টা ও নির্ভীক পথপ্রদর্শক। আপামর বাঙালির ভালোবাসা তাঁকে শুধু জাতির পিতাই করেনি, করেছে দুঃখী মানুষের বন্ধু। শতবর্ষের দ্বারে এসে তিনি আজ বিশ্ববন্ধুর স্বীকৃতিরও যথার্থ দাবিদার। স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী দেশগুলোর পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি হয়েছেন চিরস্মরণীয় এক উজ্জ্বল বাতিঘর।

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ তার অভ্যুদয় থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি দীর্ঘ নয় মাস কঠিন কারাবাস শেষে মুক্ত

হন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এই দীর্ঘ নয় মাস চিরশত্রু পাকিস্তানের মৃত্যুকূপে অবস্থানকালে অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। নিজের চোখের সামনে দেখেছেন তার জন্য কবর খোঁড়ার ভীতিকর আয়োজন। বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে সব নির্যাতনের মাঝেও তিনি ছিলেন অনড়, নির্ভীক ও আপসহীন। তাঁর চিন্তাজুড়ে কেবলই ছিল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ। নিজ ও পরিবারের চেয়েও বাংলার মানুষ ছিল তাঁর পরমাত্মীয়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি প্রিয় স্বদেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে গণমাধ্যমের কাছে বিশ্ববাসীকে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানান এবং একই সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত কোটি কোটি বাঙালির সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মানুষকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এমনকি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সময় যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকেও তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের বিরোধিতা করলেও ওই দেশের অনেক নাগরিক আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছিল। লন্ডনে অবস্থানকালে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ইংল্যান্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ এবং সেই সময়কার ইংল্যান্ডের বিরোধীদলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ইংল্যান্ডের কাছে আবেদন জানান যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য করার জন্য। এই স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতির সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আরনল্ড স্মিথ। তার কাছে বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছিলেন কমনওয়েলথে বাংলাদেশের যোগদানের অভিপ্রায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৭২ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। লন্ডনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার অবস্থান শেষে একটি বিশেষ বিমানে ভারতের রাজধানী দিল্লির উদ্দেশে হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দিল্লিতে পৌঁছান ১০ জানুয়ারি। বিমানবন্দরে মহান বীর বঙ্গবন্ধুকে সাদরে বরণ করার জন্য ভারতের উচ্চবর্গ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে ২০টি দেশের রাষ্ট্রদূত। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু ভারত সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিও সেদিন বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কুশলবিনিময় শেষে একপর্যায়ে কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে দুই নেতার পারস্পরিক আলাপ হয় ভারত-বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে। সেখানেই বঙ্গবন্ধু মুক্ত বাংলাদেশ থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহায়তাকারী মিত্রবাহিনীকে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দুই নেতার মধ্যে যে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা ও মতবিনিময় হয়, তা বঙ্গবন্ধুর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

> জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতির কারণেই এবং তা অনুসরণ করেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ। তাঁর পথ অনুসরণ করেই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন

সব জল্পনাকল্পনার পাহাড় সরিয়ে, দুস্তর পারাবার পার হয়ে কোটি মানুষের দীর্ঘ অপেক্ষা গুছিয়ে প্রিয় নেতা ফিরে এলেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন সোনার বাংলায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ। তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দর থেকে লাখো মানুষের ভিড় ঠেলে প্রিয় নেতা সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এলেন সেই চিরচেনা বঙ্গবন্ধু হয়ে। আবেগাপ্লুত রাষ্ট্রনায়কের হাতে সেই চিরচেনা মাইক্রোফোন। বাংলার প্রিয় মানুষদের খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিলেন দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পারস্পরিক

স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো। তার ঠিক দুই মাসের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাদের ফিরিয়ে নিয়েছিল ভারত সরকার। বিশ্ব ইতিহাসের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয় 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'। বঙ্গবন্ধু এই নীতির জন্যই বাংলাদেশের কোনো দেশের সঙ্গে শত্রুতা নেই, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম-অধিকারপূর্ণ সম্পর্ক সবার সঙ্গে সারা বিশ্বে। বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনের কারণেই ১৯৭২ সালের মার্চ না পেরোতেই ৫০টি দেশের স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ নীতির কারণেই ১৯৭৪ সালের মধ্যে ১২০টি দেশের স্বীকৃতি এবং একই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া এক সংবর্ধনায় কলকাতা রাজভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমার একান্ত কামনা, উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে, প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার বন্ধ্যানীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় না করে আমরা যেন তা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করায় আমরা সবাই সচেষ্ট রইব। যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে পারি এবং যেখানে আমাদের মানুষের মঙ্গলার্থে আমরা গঠনমূলক নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি। যদি আমরা সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হই, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।' এর মধ্য দিয়েই পরিচয় পাওয়া যায় এক রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উদারতা ও দূরদর্শী বুদ্ধিমত্তার। ১৯৭৪ সালে কুমিল্লায় জনসভায় দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, 'এই উপমহাদেশে আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল আর শ্রীলঙ্কা মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে বিবাদ চাই না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করতে চাই। আমি চাই না যে আমাদের বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। আমরা অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই।' ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিই ছিল বিশ্ব রাজনীতির এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুকে সেই সম্মেলনে উপস্থিত বিশ্ব উচ্চবর্গের নেতৃবৃন্দের সম্ভ্রম ছিল বাংলাদেশের জন্য একটা বড়ো অর্জন। তাছাড়া বিশ্বগণমাধ্যমের কাছে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বের ব্যাপারটিও এই বিষয়ে উল্লেখ করা অমূলক হবে না। সেখানে গণমাধ্যমের কাছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেওয়া প্রতিটি বক্তব্য ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত। বঙ্গবন্ধু জীবিত অবস্থায় সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, যার কারণে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও হজ পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর একজন ভক্ত এবং বন্ধু আলজেরীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা কর্নেল হোয়ারি বুমেদিয়ানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হজের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে।' তিনি সব সময় নির্যাতিতের পক্ষে কাজ করেছেন। তবে তিনি কোনো কিছুর জন্যই নিজের ও দেশের সম্মান নষ্ট হতে দেননি। যা কিছু অর্জন করেছেন, তা দৃঢ় মনোভাব, প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের গুণে। নিজের এবং প্রিয় জাতির ব্যাপারে আত্মসম্মানবোধ তাঁর এতটাই প্রবল ছিল।

জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতির কারণেই এবং তা অনুসরণ করেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ। তাঁর পথ অনুসরণ করেই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন। পিতার পথ অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করেছেন। আজ জাতির পিতা সম্পর্কে যখন কিছু লেখার চেষ্টা করছি, তখন ২০২০ সাল। বাংলাদেশের আপামরসাধারণের জন্য একটি ঐতিহাসিক বছর, কারণ এই বছরেই বাংলাদেশের মানুষ জন্মশতবর্ষ পালন করতে যাচ্ছে দেশের পিতা, বন্ধু ও নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। আর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালনের এই মহাক্ষণে বাংলাদেশের মানুষের ও আজকের তরুণদের অঙ্গীকার হোক বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশকে বিশ্বমানচিত্রে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম করে তোলার। অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির মতোই বঙ্গবন্ধুর খুলে দেওয়া পররাষ্ট্রনীতির পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য সন্তানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এতৎ অর্থবলের নেতৃত্বে শীর্ষে অবস্থান করুক– সেটাই হোক এক তরুণের প্রত্যাশা।

লেখক: সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সমবায়

এসএম মুকুল

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণে। সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্থায়িত্ব আনয়নে তিনি সমবায়কেই একমাত্র উপায় নির্ধারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাইরের দেশ থেকে সাহায্য এনে তাদের অভাব সাময়িকভাবে দূর করার পথ পরিহার করে স্থায়ী পথ হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে গণমুখী সমবায়ের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' দেশের সিংহভাগ গ্রামের জনগণ, যারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র– এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একমাত্র সমবায়কে অবলম্বন হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তিনি দরিদ্র অশিক্ষিতদের উন্নয়নের স্বপ্ন বিনির্মাণে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাই রাষ্ট্রের মালিকানার নীতি বিষয়ে সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র মালিকানা ব্যবস্থা হবে– প্রথমত, রাষ্ট্রীয় মালিকানা; দ্বিতীয়ত, সমবায়ী মালিকানা; তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানা।' মালিকানায় সমবায়কে দ্বিতীয় অন্যতম খাত হিসেবে স্থান দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সমাজের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সমবায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অনেকের পুঁজির সমন্বয়ে বৃহৎ বিনিয়োগ সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হয়। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মাইক্রোক্রেডিট দারিদ্র্যবিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। অথচ মাইক্রোক্রেডিটের চেয়ে সমবায় দারিদ্র্যবিমোচনে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। মাইক্রোক্রেডিটে ঋণগ্রহীতা

একজন খাতক মাত্র। সেখানে সংশ্লিষ্ট এনজিও'র নীতিনির্ধারণে ঋণগ্রহীতার কোনো ভূমিকা নেই। আর মাইক্রোক্রেডিটের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দরিদ্র মানুষের পণ্যের উপযুক্ত মূল্য অর্জনে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি ও উদ্যোক্তা তৈরি সম্ভব। ক্ষুদ্রঋণ শুধু দরিদ্র মানুষের জন্য।

বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।' বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন অর্থনৈতিক সামগ্রিক উন্নয়নের সুফল সামাজিকভাবে পেতে হলে সমবায়কে সত্যিকার গণতন্ত্রায়ণে নিয়ে আসতে হবে। সমবায় সংস্থাগুলোকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ঘোষণা করেন– 'সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। দেখতে হবে যে, সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে।' আমরা জানি, সমবায়ের মূলধারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইতিবাচক। সমবায়ের মূলকথা– আমাদের সঞ্চয়, আমাদের বিনিয়োগ, আমাদের সমৃদ্ধি। সমবায়ের লক্ষ্য হলো স্বাবলম্বন ও স্বনির্ভরতা। বাংলাদেশের সংবিধানে উৎপাদন ও মালিকানা ব্যবস্থায় 'সমবায়'কে একটি অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ইউএনডিপি-আইএলও'র এক যৌথ মিশন বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলবিষয়ক একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করে। রিপোর্টে সমবায় খাতকে পুনর্বিন্যাসের নিমিত্ত সমবায় আইন সহজীকরণ, সমবায় অধিদপ্তরকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচির সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে দারিদ্র্যবিমোচনে সমবায়কে সম্পৃক্তকরণসহ জাতীয় সমবায় নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে– বঙ্গবন্ধু যে গণমুখী সমবায়ের সূত্রপাত করেছিলেন, কার্যত এর বাস্তবমুখী প্রতিফলন ঘটছে না। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের রূপরেখা ঘোষণা করেছেন। এই সরকারের আমলেই সমবায়কে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ অনুযায়ী সমবায়ের নীতিমালাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তেমন তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালিতে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আগামী ৫ বছরে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ৬৫ হাজার গ্রামে বিভিন্নমুখী সমবায় চালু করবে।' বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালি জাতির সাঁইকি। তাই তিনি সব ধরনের উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন দেশের আপামরসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,

বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অধিকার পাবে

'সমবায়ের পথ– সমাজতন্ত্রের পথ, সমবায়ের পথ– গণতন্ত্রের পথ।' কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী চেতনার মূলধারা থেকে দেশ অনেকটাই বিচ্যুত। গণমুখী সমবায়ে বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির কথা পাঠ্যসূচিতে উঠে আসা দরকার।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালির মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে সমবায়কে দ্বিতীয় স্থানে নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন– 'সমবায় হবে সম্পূর্ণ গণমুখী ও গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এর নীতি হবে সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক।' স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে জোরালো ও গণমুখী করার লক্ষ্যে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে সার সরবরাহ, সহজ শর্তে ঋণদান, মৎস্য সরঞ্জাম আমদানি শুল্ক রহিত, মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা প্রদান, তাঁতিদের উৎপাদিত সুতা থেকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান, তাঁতশিল্প সরঞ্জাম আমদানিতে আইন প্রণয়ন, তাঁতিদের সহজ শর্তে ঋণদান ইত্যাদি সেসময় করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে– যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে বিন্দু থেকে সিন্ধু গড়ে ওঠে। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবায় আন্দোলন প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে। সমবায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যবিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সংস্কার, খাদ্য সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। কৃষি, মৎস্য, তাঁত, সেচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সব সমবায়ী দারিদ্র্যবিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে রং বদলাচ্ছে সমবায়ের। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– '... এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণেধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। সমবায় হবে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ... ভাইয়েরা আমার– আসুন, সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। ... আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা।'

লেখক: কৃষি-অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন বিশ্লেষক

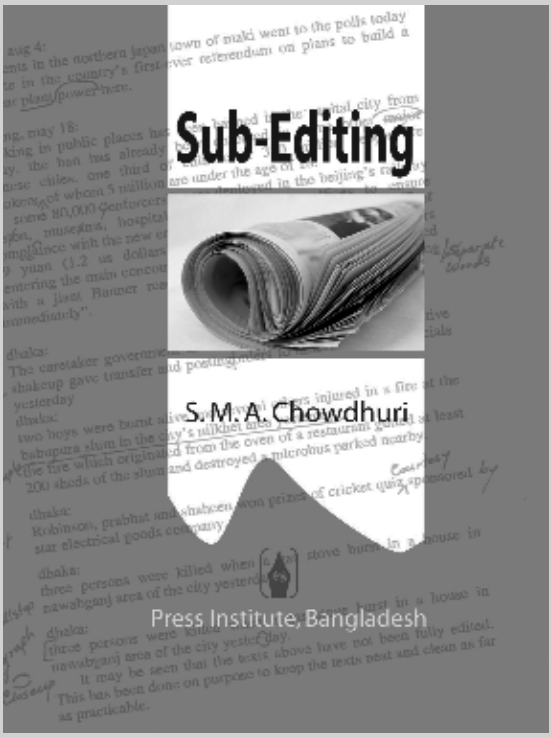

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর আত্মদর্শন ও পর্যালোচনা

রফিকুল ইসলাম পিন্টু

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা– যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

তিনি ছিলেন সময়ের অসম সাহসী সন্তান, ছিলেন উদার নৈতিকতাসম্পন্ন, বন্ধুবৎসল, স্নেহশীল, ক্ষমাশীল, দৃঢ়চেতা একজন পরিপূর্ণ মানুষ। মহত্ত্বের যে গুণাবলি, এর সবটাই ছিল তাঁর চরিত্রের ভেতরে। সম্ভবত নজরুলের সেই নীতিবাক্য– 'যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগৎকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাহারা বৃহত্তের চিন্তা করেন তাহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ সাধন করেন' অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। নির্যাতিত-নিষ্পেষিত-নিপীড়িত, শোষিত জনতার অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এর জন্য তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছিল বহু বন্ধুর পথ। আর তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সেভাবেই। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে এসেছিলেন খুব অল্প বয়সে– নজর কেড়েছিলেন বহুবার, শিষ্যত্ববরণ করে বিকশিত হয়েছিল প্রতিভা, অর্জন করেছিলেন নেতৃত্ব দেওয়ার পর্যাপ্ত গুণাবলি। নেতৃত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের ধারায় প্রবহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামের একটি দল। তিনি কখনো নৌকায় চড়ে, কখনো বা সাইকেল চালিয়ে আর অধিকাংশ সময় হেঁটে এই দলকে একটি শক্তিশালী

রূপ দিয়েছিলেন। শুনলে অবাক হই, তিনি আগরতলা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত একটানা ২৬ কিমি. পথ হেঁটেছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রফিক-সালাম-বরকতসহ অন্য ভাষাসৈনিকদের পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়া, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ছেষট্টির ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে না দেওয়া– এ সবকিছুই কঠিনভাবে নাড়া দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কোমল হৃদয়কে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এহেন নির্মম-নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিলেন, যার জ্বলন্ত প্রমাণ পাই ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, 'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ... ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরে ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ... আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'

অধিকারহারা জাতির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এক আঙুলের ইশারায়, তিনি ৭ কোটি বাঙালিকে সমবেত করেছিলেন এক কাতারে এবং বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। পৃথিবীর মানচিত্রে ৫৫ হাজার ৫৯৮ বর্গমাইলের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ স্থান করে নিয়েছিল জাতির পিতার নেতৃত্বে। রক্ত ঝরেছিল ৩০ লাখ বাঙালির আর দুই লাখ মা-বোন হারিয়েছিল তাদের ইজ্জত। তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা মনোবল আর অসীম সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে দীর্ঘদিনের জেল-জুলুম-হুলিয়াকে পদদলিত করে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম দিয়েছিলেন। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় তিনি নিজের পরিবার-পরিজনের চেয়ে দেশের মানুষের কথা বেশি ভেবেছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে: 'I like my people first and then my family.' তিনি ছিলেন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব– যখন কোনো বিষয়ে মন্তব্য করতেন, খুব ভেবেচিন্তে করতেন।

সত্তরের নির্বাচনে তাঁর দলের আসন পাওয়া সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল এবং নিজের জীবনের শেষ পরিণতির বিষয়েও বলেছিলেন, 'I will never die in a natural death.' অর্থাৎ আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না। (বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলামের বই থেকে)। একজন উচ্চমাপের দার্শনিক ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই ধরনের কথা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা জোরগলায় বলতে পারি, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন দার্শনিক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন বঙ্গবন্ধুকে জেলখানায় বন্দিদশা অবস্থায় কবর দেখিয়ে বলেছিল, একদিকে তোমার কবর আর অন্যদিকে তোমার স্বাধীনতা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান। মুসলমান বারে বারে মরে না, একবারই মরে।' কতটা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন এই মানুষটি। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আজও জাতি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে মহান এই নেতাকে। মহান এই নেতার জন্মশতবার্ষিকীর সব আয়োজন সফল হোক।

লেখক: সাংবাদিক

অধিকারহারা জাতির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এক আঙুলের ইশারায়, তিনি ৭ কোটি বাঙালিকে সমবেত করেছিলেন এক কাতারে এবং বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'

অনন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বঙ্গবন্ধু

রফিক আহমদ খান

পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়ায় মাত্র চুয়ান্ন ভাগ জনগণ মুসলিম হলেও দেশটির রাষ্ট্রীয় ভিত্তি, অনুশাসন আচার-আচরণ পৃথিবীর অন্য কোনো আশি-নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশের চেয়ে বেশি ইসলামিক। মালয়েশিয়ান মুসলিমরা ধর্ম নিয়ে যেমন আন্তরিক, তেমনি সচেতনও। তবে তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই। ভীষণভাবে ধর্মানুরাগী দেশ মালয়েশিয়ারও জাতির পিতা আছে। এই লেখায় মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক সম্পর্কে আলোচনা করব, সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা।

মালয়েশিয়ানরা অবশ্য জাতির জনক বলে না। তারা বলে স্বাধীনতার জনক বা মালয়েশিয়ার জনক। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক তুনকু আবদুর রহমান। ১৯৫৭ সালে তাঁর নেতৃত্বেই ব্রিটিশের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ৩১ আগস্ট। স্বাধীনতা লাভের পর আবদুর রহমানই দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এর পূর্বে তিনি মালয় ফেডারেশনের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৯৫৫ সাল থেকে। 'তুনকু' তাঁর নামের কোনো অংশ নয়, সেটা দেশটির আগং (রাজা) কর্তৃক দেওয়া সর্বোচ্চ উপাধি। তিনি ১৯০৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি দেশটির কেডাহ প্রদেশের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর ৮৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তুনকু আবদুর রহমানের রাজনৈতিক দলের নাম United Malays National Organisation (UMNO) আমনো। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা এনে দেওয়া দল আমনো দেশটির স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্ষমতায় এসেছে বারবার। ৬১ বছর পরে এসে ২০১৮ সালের ৯ মে ক্ষমতা হারায় আমনোর নেতৃত্বে বারিসান ন্যাশনাল জোট। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতা এই ইউনাইটেড মালয়

ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (আমনো) থেকে বেরিয়ে নিজে নতুন দল গঠন করেছেন– এমন অনেক দল আছে মালয়েশিয়ায়। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে আমনো থেকে বেরিয়ে নতুন দল গঠন করেন আগে আমনোর প্রধান হিসেবে ২২ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা (১৯৮১-২০০৩) ড. মাহাথির মোহাম্মদ। মাহাথিরসহ অন্য বিরোধী নেতারা স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের কঠোর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু কখনো কোনো সমালোচনা নেই তুনকু আবদুর রহমানকে নিয়ে। স্বাধীনতার জনক নিয়ে ইতিবাচক কথা ছাড়া কোনো নেতিবাচক কথা নেই। আছে অগাধ সম্মান। সব দলের কাছেই তুনকু আবদুর রহমান স্বাধীনতার জনক। দেশের সব মানুষের কাছেই তুনকু আবদুর রহমান স্বাধীনতার জনক। মালয়ের (মুসলিম) কাছে যেমন তিনি স্বাধীনতার জনক, তেমনি মালয়েশিয়ান চাইনিজ ও মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ানদের কাছেও। এখানে কোনো বিতর্ক দেখিনি। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের ৯ মে পর্যন্ত কুয়ালালামপুর শহরে অধিকাংশ নাগরিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের কড়া সমালোচক ছিলেন। নাজিবের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো আন্দোলন হয়েছে দেশটিতে। লাখো মানুষ আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। কিন্তু মালয়েশিয়ার জনক তুনকু আবদুর রহমান রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তাঁর দুটো পরিচয় দেখি– প্রথমত, তিনি স্বাধীনতার জনক বা মালয়েশিয়ার জনক। দ্বিতীয়ত, তিনি দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এই দুই পরিচয়ে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সর্বজনে সম্মানিত। এমন একটি দেশে থেকেও আমাদের বাংলাদেশের কোনো কোনো মানুষ যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বীকার করতে কৃপণতা দেখান, তখন নিজের কাছে খুবই খারাপ লাগে। একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের অনুসারীরা দেশে-বিদেশে এখনো ছড়িয়ে আছে, তারাই বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে কৃপণতা দেখায়। যে মানুষটি না হলে আজকের এই লাল-সবুজের পতাকা পেতাম না, স্বাধীন একটি দেশ পেতাম না, তাঁকে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ কেন!

'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' একাত্তরের ৭ মার্চে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির পথ দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু যেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, এর জন্যই তো আমরা চিরঋণী থাকব বঙ্গবন্ধুর কাছে। তুনকু আবদুর রহমান দেশের জন্য জেল-জুলুমের শিকার হননি। আর দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর কী পরিমাণ জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে, তা তো ইতিহাস সাক্ষী। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। বাঙালির অধিকারের কথা, বাঙালির মুক্তির কথা বলেছিলেন।

> আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা থাকবে, থাকুক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুই শ্রদ্ধা-সম্মানের নেতা হিসেবেই বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির প্রাণে, প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিকের প্রাণে– যতদিন পৃথিবীর বুকে 'বাংলাদেশ' নামক দেশটি থাকবে

এখন আমাদের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাংলাদেশের জাতির পিতা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জনক হিসেবে আর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে। শুধু আওয়ামী লীগ পরিবারের কাছে নয়, বঙ্গবন্ধুর জন্য শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসা বিরাজমান দেশের সব জনগণের হৃদয়ে। শুধু হৃদয়ে থাকবে তা নয়, বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান দেখাতে বাংলাদেশের কোনো মানুষই কৃপণতা করবে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধু সবার। বঙ্গবন্ধু টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া সারা দেশের। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা থাকবে, থাকুক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুই শ্রদ্ধা-সম্মানের নেতা হিসেবেই বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির প্রাণে, প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিকের প্রাণে– যতদিন পৃথিবীর বুকে 'বাংলাদেশ' নামক দেশটি থাকবে। জয় বাংলা।

এই লেখা লিখতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে মালয়েশিয়ানদের 'মুজিবুর' প্রেমের কথা। হ্যাঁ,

মালয়েশিয়ায় এখন যারা প্রবীণ, মানে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই মুক্তিযুদ্ধের সময় তরুণ ছিলেন, তারা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চেনেন 'মুজিবুর' নামে। মুজিবুরকন্যা শেখ হাসিনার নামের আগে ঠিকই 'শেখ' হাসিনা বলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বেশির ভাগ প্রবীণ মালয়েশিয়ান মুজিবুর বলেন। মালয়েশিয়ায় দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে বহু মালয়েশিয়ানের মুখে শুনেছি এ নাম। প্রবাস-জীবনের প্রথমদিকে যখন আমি প্লাস্টিক কারখানায় চাকরি করি, তখন আমার বস মোহাম্মদ জাহায়মি জাকারিয়ার মুখে শোনতাম মুজিবুরের কথা। তখন আমি মালয় ভাষা জানতাম না। বস ভালো ইংরেজি জানতেন, ইংরেজিতেই আমাকে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুরের কথা, একাত্তরের কথা বলতেন। তিনি সেই সময় (১৯৭১) মালয় পত্রিকায় নিয়মিত বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের খবর পড়তেন। পাকিস্তানের হিংস্রতার কথা, শোষণের কথা আর এর প্রতিবাদে বাঙালির মুক্তি-লড়াইয়ে মুজিবুরের ডাক, সাহসী ও দৃঢ় নেতৃত্বের কথা সেই সময় জেনেছেন তিনি। তার কথায় ফুটে উঠত মুজিবুরের প্রতি অগাধ সম্মান, ভালোবাসা। বাঙালির বীরত্বগাথা মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প তার মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে সেই সময়। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতাবিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, সে কথাও শোনাতেন বস। যখন বসের মুখে এসব শোনতাম, তখন আমি বয়সে অনেক বেশি তরুণ ছিলাম। বস নিজেও জানেন আমার জন্ম মুক্তিযুদ্ধের এক দশক পর। তাই তিনি নিজের জানা গল্পগুলো শেয়ার করতেন আমার সঙ্গে গল্পে-আলাপে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অজানা অনেক গল্প শোনতে আমার ভালো লাগত। তাও একজন ভিনদেশির মুখে। তিনিও বলতেন আনন্দের সঙ্গে।

মাঝে এক প্রজন্ম আমাদের মতো মালয়েশিয়ানরাও মুজিবুরকে জানার সুযোগ পাননি। ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর টানা একুশ বছর আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে জানার সুযোগবঞ্চিত হয়েছিলাম, ঠিক সেই সময় মালয় প্রজন্মরাও জানতে পারেননি মুজিবুর সম্পর্কে। শুধু বাংলাদেশ বা মালয়েশিয়া নয়, খুনিরা একুশ বছর বঙ্গবন্ধুকে আড়ালে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুনিরা সফল হয়নি। আজ বঙ্গবন্ধুর কীর্তির কথা সবাই জানেন। ২০০৯ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুকে জানার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। বঙ্গবন্ধুকে জানতে পারছে সমকালীন বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম। শেখ মুজিবের গুণের কাহিনি ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। তারুণ্যের কাছে আদর্শ রাজনৈতিক নেতার প্রতীক এখন বঙ্গবন্ধু। শেখ মুজিবের বক্তব্যগুলো তরুণরা শোনতে ভালোবাসে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ গঠনের আহ্বান জানিয়ে নানা সময়ে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণগুলো ইউটিউবে শোনে এখনকার তরুণরা দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এটা বিশাল ইতিবাচক দিক এই সময়ে।

গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সরকার আসবে আর যাবে। কোনো সরকার চিরকাল থাকবে না। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীও একদিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতিও একদিন সাবেক রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবেন। সেটা জীবদ্দশায় হোক বা জীবনাবসানে হোক। কিন্তু কখনো সাবেক হবেন না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যতদিন পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন বাংলাদেশের পিতা হয়ে থাকবেন।

এখন ভালো লাগে যখন ঘরের প্রাইমারিতে পড়ুয়া ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মুখে বঙ্গবন্ধুর কথা শুনি। ছোটোদের কাছে বঙ্গবন্ধু ঠিকই এক মহানায়ক, স্বাধীনতার মহানায়ক; বাংলাদেশের জনক। ওরা এখন অনেক গল্প জানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে নিয়ে এই জানাজানি, গল্প বলাবলি চলতে থাকুক চিরকাল– ভালোবাসায়-সম্মানে।

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন সময়ের দাবি

এসএম ইমরান হোসেন

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুন পরিবারে আলো করে আসেন তৃতীয় সন্তান 'খোকা'। কেউ হয়তো বা কল্পনাই করেননি এই 'খোকা' পরবর্তী সময়ে হয়ে উঠবেন বাঙালি জাতিসত্তার ভাগ্যবিধাতা। মা-বাবার আদরের সেই 'খোকা' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে হয়ে উঠলেন পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক। তবে 'খোকা' থেকে 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠার এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। রাতারাতি এটি ঘটেনি। নানা চড়াই-উতরাই এবং ঘাত-প্রতিঘাতের কঠিন পথের মধ্য দিয়ে সেটি সম্ভব হয়েছিল।

মূলত নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানুষের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হওয়ার বিরল গুণাবলি নিয়েই জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন তরুণ প্রজন্মের জন্য দারুণ এক অনুপ্রেরণা। জীবনে কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বাঙালি জাতিকে কখনো বিশ্বের কাছে ছোটো হতে দেননি। মূলত ছাত্রজীবনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শন করতে এলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে স্কুলের ছাদ মেরামত এবং ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে ন্যায্য দাবি তুলতে একটুকু কুণ্ঠিত হননি বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে'– এমন ঘোষণার

পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধু। শাসকের রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় পাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের একটি ন্যায়সংগত আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যারা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে মুচলেকা দিয়ে অন্যরা ছাত্রত্ব বজায় রাখলেও বঙ্গবন্ধু নীতির সঙ্গে আপস করেননি। তিনি কোনো মুচলেকায় সই দিতে অস্বীকৃতি জানান। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নীতির প্রশ্নে আপসহীন এক বঙ্গবন্ধুকে আমরা চিনতে পাই। যিনি ন্যায়ের প্রশ্নে নিজের আইন পেশার ক্যারিয়ারকে তুচ্ছ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে একটি জাতিকে সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন। বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো মানুষ বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে এসেছেন, তখনই তাদের প্রত্যেকের মনে একধরনের গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। জীবনের একটি বড়ো অংশ তিনি কাটিয়েছেন জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে। যে সময় বাইরের খোলা আলো-বাতাসে থেকেছেন, সেই সময়টাও পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারেননি। শাসকের রক্তচক্ষু আর গোয়েন্দার দল তাঁকে অনুসরণ করেছে ছায়ার মতো। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি সবকিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন মুহূর্তের মধ্যে। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন কোনোভাবেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বস্তুত এটিই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণার একটি মেসেজ লোক মারফত দিয়ে যান: 'এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যা-ই তোমাদের হাতে আছে, তার দ্বারাই শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তিটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।' এটি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তিনি জানতেন এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তাই সব ধরনের প্রস্তুতি তিনি নিয়ে রেখেছিলেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটি তিনি তাঁর নেতাকর্মীদের ভালোভাবেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রবাসী সরকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে সরব হয় বাঙালিরা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় বীর বাঙালি। গ্রামের কিশোর, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, পাড়ার বখাটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক– সবাই লড়েছে কাঁধে কাঁধ রেখে। এই জনযুদ্ধের মূল ভাবনাটি ছিল বঙ্গবন্ধুর। তিনি জানতেন এই জনযুদ্ধে জয় আমাদেরই।

> শাসকের রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় পাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের একটি ন্যায়সংগত আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর পাকিস্তানিরা যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে না সেটিই স্বাভাবিক। খোদ বঙ্গবন্ধুও জানতেন পাকিস্তানিরা তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তবে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি পাকিস্তানিরা। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে বিজয়ী বাংলাদেশ। তবে ৩০ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের ত্যাগে অর্জিত হলো স্বাধীনতা। আমরা কি একবার ভাবতে পারি, ৩০ লাখ মানুষ হাতে হাত রেখে ব্যারিকেড তৈরি করলে সেটি কতশত মাইল লম্বা হয়? ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি নিজের স্বপ্নের স্বাধীন দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর প্রাণের দেশে, যে দেশের মানুষকে

তিনি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। দেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে তিনি নতুন করে গড়ে তুলতে চাইলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ালেন। এই সময়ে তিনি দেশের ভেতরে যেখানেই গিয়েছেন, সবখানেই একটি দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানতেন কাজটি কঠিন। দেশের ভেতরে পরাজিত শক্তি ঘাপটি মেরে বসে ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী চক্র। যাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশকে স্বাধীন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি জানতেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এই স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হবে। ষড়যন্ত্রকারীরা নানাভাবে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। যেটি কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই কি ছিল প্রাপ্য? একটি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার এই কি পরিণাম? পাকিস্তান আমলে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন জেলে এই ভেবে যে, একদিন দেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে, তাঁর নিজের দেশের মানুষ তাঁকে হত্যা করতে পারে, সেটি কি ভাবা সম্ভব? আমরা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করতে পেরেছি; কিন্তু খুঁজে বের করতে পেরেছি কি কাদের ষড়যন্ত্রে সেদিন তিনি নিহত হয়েছিলেন? কারা ছিল এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড? আমরা যদি সেটি খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদের বিচারের কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন আমাদের ভালোবাসায়। যে আদর্শ তিনি আমাদের মাঝে রেখে গিয়েছেন, সেই আদর্শের পথ ধরেই তরুণ প্রজন্ম একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বেই।

লেখক: শিক্ষক, টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তরুণ প্রজন্ম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

তালহা তানজিল সজিব

তরুণ বয়স এমন এক সময়, যখন নির্ভর করে একটি মানুষের ভবিষ্যৎ কেমন হবে। তরুণ বয়সের শিক্ষা একটি মানুষের ভেতর সারাজীবন দাগ কেটে যায়। তরুণ বয়স ভোলার মতো নয়। এই বয়সে মানুষ যেমন মন ও বুদ্ধির দিক থেকে চঞ্চল এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকে, মনে হয় যেন গোটা বিশ্ব দখল করে ফেলা যাবে। তাই তো তরুণ কবি 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' তাঁর '১৮ বছর বয়স' কবিতায় লিখে গেছেন:

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

আমাদের তরুণসমাজ আকৃষ্ট হয় কোনো এক তরুণ খেলোয়াড়ের বিশ্ব জয় দেখে। কোনো এক তরুণ উদ্যোক্তার উদ্যোগে সফলতার গল্প শুনে। আবার তরুণ প্রোগ্রামার মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক দিয়ে দুনিয়া কাঁপানোর গল্প আমাদের তরুণসমাজকে খুব আকৃষ্ট করে। এমনকি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন তরুণ কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গেও বয়সটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি আর ভাবি, সেও একজন তরুণ, আমিও একজন তরুণ। একই যুগের মানুষ আমরা। একই চিন্তাধারা আমাদের। একজন তরুণ হিসেবে এমন সব সফল তরুণ মানুষকে দেখে মনের ভেতর প্রেরণা জাগে বড়ো কিছু করার, বড়ো কিছু হওয়ার।

হয়তো সেই আগ্রহ থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তরুণ-জীবনের ঘটনাবলি সম্পর্কে আগ্রহ বেশি। কারণ, সেই তরুণ বয়সেই শেখ মুজিবের ভেতর এমন কোনো বীজ বপন হয়, যা তাঁকে ভবিষ্যতে 'শেখ মুজিব' থেকে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে' রূপান্তর করেছে।

তিনি যখন কোনো কাজ করতেন, তা করতেন অনেক চিন্তাভাবনা করে। তিনি কোনো কিছু করার আগেই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেছেন। যদি তাঁর কাছে সঠিক মনে হতো, তা সম্পূর্ণ না করে পিছু হটতেন না বা হারও মানতেন না। অগ্রসর হতেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে। তিনি জীবনে অনেকবার জেলে গিয়েছেন। কিন্তু থেমে যাননি বা পিছু হটেননি। একটাই কারণ, কঠোর মনোবল। তিনি জানতেন, যেই আন্দোলন তিনি করছেন, তা সঠিক এবং তা রক্ষা করতে হলে অনেক চড়াই-উতরাই তাঁকে পার করতে হবে। তাই তিনি মনের দিক থেকে সদা নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন। মনোবল ধরে রাখতেন। হাল ছেড়ে দিতেন না। কথার সঙ্গে কাজের সব সময় মিল রেখেছেন। কখনো ধৈর্যহারা হননি। তিনি জানতেন, রাতারাতি কোনো কিছু সম্ভব না। ধৈর্যের সঙ্গে সময় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। পরের জন্য কোনো কাজ তিনি ফেলে রাখতেন না এবং সময়ের অপব্যয়ও করতেন না। আর সেজন্যই এতবার জেলে যাওয়ার পরও সময়ে-অসময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যাতায়াত করার পরও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন অদম্য আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। থাকতেন সিদ্ধান্তের প্রতি অটল। কারণ তিনি যে অসীম সাহসী এক কিংবদন্তি।

অন্যদিকে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম, যারা শুধু বাংলাদেশ নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশের নাগরিক। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তিলে তিলে গড়ে উঠতে দেখা একটি প্রজন্ম। এই প্রজন্ম ছোটোবেলায় দেখেছে সাদাকালো টিভি এবং এখন সেই প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট প্রতিমুহূর্তের অপরিহার্য এক সঙ্গী। এই প্রজন্ম দেখেছে ল্যান্ডফোন এবং এখন প্রতি পদক্ষেপে তাদের প্রয়োজন স্মার্টফোনেই। তবে এই সুবিধা ভোগকারী প্রজন্মকেই তার নিজের দেশ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আগামী দিনের পথে। প্রতিদিন উপভোগ করতে হবে নতুন সেই স্বাধীন সূর্য। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা যে কঠিন, সেটাও বুঝতে হবে এবং এজন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে এই প্রজন্মকে।

তরুণ প্রজন্ম আসক্ত ইন্টারনেটে। এই আসক্তিতে প্রতিনিয়ত চলে সময় অপচয়ের প্রতিযোগিতা। সময়ানুবর্তিতা নেই বললেই চলে। তাদের ভেতর কাজ করে হতাশা। অনেকেই নিজেকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাচ্ছে নানা রকমের অন্ধকার জগতে। কোনো মানুষ দোষী হয়ে জন্ম নেয় না। দোষী হয় সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে। যেমন তরুণ শেখ মুজিব চাইলেই পারতেন স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাতে, যা বর্তমান তরুণদের ভেতর ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন স্রোতের বিপরীত দিক। একটি বিখ্যাত উক্তি আছে: 'Only dead fish go with the flow.' আজ যদি এই বর্তমান তরুণ প্রজন্মের আচরণের একাংশও তখনকার তরুণ শেখ মুজিবের থাকত, তাহলে আজও হয়তো আমরা পরাধীন থাকতাম এবং আমার এই লেখাটি হয়তো কখনোই বাংলায় লেখা হতো না। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের প্রাত্যহিক জীবনে যদি তারা শেখ মুজিবের জীবনাদর্শ থেকে কিছুটা শিক্ষা নিয়ে চলত, তাহলে জীবনের গতিপথ অনেক সহজ হয়ে যেত। বর্তমানে লক্ষণীয়, আমরা কোনো কাজ করার জন্য একদম শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করি। দিন শেষে কাজটায় সফলতা না এলে ভাগ্যকে দোষারোপ করি। আসল কথা হলো, দোষটা আমাদের নিজেদের এবং সেটা আমরা বুঝতেও চেষ্টা করি না। আমরা পড়ে থাকি ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। কিন্তু ভাগ্য যে নিজে নিজে পরিবর্তিত হয় না, সেটা বুঝেও আমরা অবুঝের মতো সময় পার করি। অলসতা আমাদের নিত্যসঙ্গী। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু জেলে বসেও সময় অতিবাহিত করেছেন পড়ালেখা করে। এমনকি তিনি তাঁর আত্মজীবনীও লিখেছেন জেলে বসে। তিনি কখনো ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বসে থাকতেন না। তিনি নিজে তাঁর ভাগ্য গড়ে নিতে জানতেন। আমরা যেমন কোনো ভুল করলে দোষারোপ করার কাউকে খুঁজি, তিনি সব দোষ, দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নিয়ে নিতেন। আর সেজন্যই তিনি জীবনের সব থেকে বড়ো শিক্ষাগুলো নিয়েছেন নিজের ভুল থেকেই। চেষ্টা করেছেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার। এভাবেই তো একটা মানুষের জীবনের চলার পথ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা পায়। তাই তো তরুণ শেখ মুজিব ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছেন বাংলার বন্ধুতে।

আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলি। তবে সেই আদর্শ শুধু মুখে বা খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তা কাজে লাগাতে হবে সঠিক উপায়ে, সঠিক সময়ে। ধৈর্য ধরতে হবে। রাতারাতি কোনো কিছুই সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের তরুণসমাজের ভেতর অন্যতম একটি বড়ো সমস্যা– আমরা সবকিছু তাৎক্ষণিক আশা করি। কোনো একটি কাজ এই মাত্র করা হয়েছে মানে এর ফলও এখনই আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু তাৎক্ষণিক উপায়ে কখনোই ভালো কোনো কাজের সুফল আসে না। সাময়িক আনন্দ সাধারণত সেসব জিনিসেই পাওয়া যায়, যা ভালো কোনো কাজের নয় বললেই চলে। কিন্তু যেসব কাজ আসলেই আমাদের জন্য ভালো ফল বয়ে নিয়ে আসবে, সেসব কাজের পথ সব সময় কিছুটা কঠিন। কিন্তু সেসব কাজই একজন মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ও নিরাপদ করে থাকে। অন্যদিকে সাময়িক আনন্দ একজন মানুষকে তার লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়। বিভ্রান্ত করে। অন্ধ করে দেয়। কিন্তু সফলতা কখনোই তাৎক্ষণিকভাবে আসে না। এর জন্য শ্রম, ত্যাগ, প্রতীক্ষা ও সঠিক সময়ের প্রয়োজন।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই স্বাধীনতাযুদ্ধের বীজ বপন হয়েছিল দেশভাগের সময়। আবার যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, তা রক্ষা করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অর্থাৎ জীবনে প্রতিবন্ধকতা আসবেই। জীবনকে প্রতিমুহূর্তে ছুড়ে দিতে হবে চ্যালেঞ্জ। এই ধরনের অদম্য সাহসিকতার প্রয়োজনই ছিল একটি দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তরুণ প্রজন্মেরও উচিত তাদের জীবনের গতিপথ ঠিকভাবে ধরে রাখা। তা জীবনের উন্নতি করার জন্য, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য। তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক: শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী: বঙ্গবন্ধুর খোঁজে

সুমিত বণিক

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু প্রায় সমার্থক। হাজার বছর ধরে বাঙালি একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করে আসছিল। সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল– বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও জাগ্রত নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে দখলদার পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা এবং অবিস্মরণীয় বিজয়। কিন্তু এই বিজয় অর্জনের আগে উনিশ শতকের শুরু থেকে কেমন ছিল আমাদের মাটি ও মানুষের রাজনীতি, কেমন ছিল এখানকার রাজনৈতিক নেতাদের মানসকাঠামো– এর কোনো প্রামাণ্যগ্রন্থ অনেকদিন আমাদের কাছে ছিল না। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সেই অভাবই কেবল পূরণ করেনি, আমাদের ইতিহাসের আয়নায়ও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে আমরা যেমন আমাদের চিনতে পারছি; একইভাবে আবিষ্কার করতে পারছি সেই কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলও।

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, সৌন্দর্যবোধ ও সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির কথা এবং আব্বাস উদ্দীনের গানে মুগ্ধ হওয়ার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বইটি উল্লেখযোগ্য দুটি কারণে– এটি প্রধানমন্ত্রীর ছয় পৃষ্ঠার একটি ভূমিকায় সমৃদ্ধ এবং ভাষান্তরটি যথার্থই প্রশংসনীয়। এজন্য এর অনুবাদক অবশ্যই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বাঙালি কালে-কালেই শাসক-শোষকের বিভিন্ন কুচক্রান্তে আবর্তিত হয়েছিল। আর যুগে যুগে জন্ম হয়েছিল কিছু নির্লোভ সূর্যসন্তানের। যাঁরা মাতৃভূমির মানকে সমুন্নত রাখতে তুচ্ছ করেছিল নিজের জীবনকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে উজ্জীবিত করেছিল পুরো জাতিকে। বিনিময়ে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে বরণ করে নিয়েছিল শত বঞ্চনা আর অমানুষিক অত্যাচার। তবুও স্বপ্নকে বিকিয়ে দেয়নি। মাথা নত করেনি

পরদেশি শাসকের বর্বর নির্যাতনের কাছে। কংগ্রেস থাকতে মুসলিম লীগ কেন? মুসলিম লীগ থাকতে আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন? কোন প্রেক্ষাপটে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়? লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রবক্তা এ কে ফজলুল হক কেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন? অথবা পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হয়েও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লেখক কেন সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন? এসব ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে ১৯৬৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বইটি রচনা শুরু করেন। তাঁর স্মৃতিময় জীবনের প্রথমার্ধই অর্থাৎ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থের উপজীব্য। ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেন, 'মনে হচ্ছিল, আল্লাহর তরফ থেকে ঐশ্বরিক অভয়বাণী এসে পৌঁছল আমার হাতে', যা এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্বই ফুটিয়ে তোলে।

২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা আকস্মিকভাবে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। খাতাগুলো অতি পুরোনো, পাতাগুলো জীর্ণপ্রায় এবং লেখা প্রায়ই অস্পষ্ট। মূল্যবান সেই খাতাগুলো পাঠ করে জানা গেল এটি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, যা তিনি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরিন অবস্থায় লেখা শুরু করেছিলেন; কিন্তু শেষ করতে পারেননি। জেল-জুলুম, নিগ্রহ-নিপীড়ন যাঁকে সদা তাড়া করে ফিরেছে; রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সদাব্যস্ত বঙ্গবন্ধু যে আত্মজীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন এবং কিছুটা লিখেছেনও, এ বইটি তার স্বাক্ষর বহন করছে। বইটিতে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখকের বংশপরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশভাগের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। আছে লেখকের কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি– সর্বোপরি সর্বংসহা সহধর্মিণীর কথা, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সব দুঃসময়ে অবিচল পাশে ছিলেন। একই সঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও বইটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু যেন এক মানবীয় উপাখ্যান। যার পরতে পরতে ছিল নিষ্ঠা, দেশপ্রেম আর আত্মোৎসর্গী মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যদি এই বইটির রসদ অর্থাৎ ডায়েরিটা না লিখে যেতেন, তাহলে বাঙালি জাতি তথা বর্তমান প্রজন্ম জানতই না বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সম্পর্কে, দেশের জন্য তাঁর মমত্ববোধ আর অসামান্য আত্মত্যাগের কথা। আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে, তাঁরই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সহযোগীরা বিষয়টির অন্ত্যমিল রেখে সুচারুভাবে পাঠোদ্ধার করেছেন। বাঙালি জাতি সুযোগ পেয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতার আত্মোপলব্ধি ও জীবনবোধের সাবলীল কথাগুলো জানার। যুগে যুগে বাঙালির দাবি ও আন্দোলন-উজ্জ্বল সংগ্রামের এই অগ্রণী ভূমিকা বাঙালি জাতির ইতিহাসকে করেছে চিরস্মরণীয় ও সমৃদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তর-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের কাছে অবিসংবাদিত নেতা।

বঙ্গবন্ধু যেন এক মানবীয় উপাখ্যান। যার পরতে পরতে ছিল নিষ্ঠা, দেশপ্রেম আর আত্মোৎসর্গী মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না'– চোখের পানিতে এই প্রতিজ্ঞা যিনি করেছিলেন, বাংলার মানুষের জন্য যিনি জেলখানায় পার করেছেন অর্ধেক সময়, বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গোপালগঞ্জের কিশোর শেখ মুজিব যখন ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠছেন, ঠিক তখনই সমাপ্ত হলো তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী। আর তাঁর আত্মজীবনীর মতো জীবনটাকেও অসমাপ্ত করে দিল এই বাংলারই কিছু মানুষ। কিন্তু আজ সেই অসমাপ্ত ইতিহাসই নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে বাংলার মানুষের হৃদমাঝারে।

লেখক: সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু এবং 'কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন নয়'-এর দর্শন

শিশির রেজা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ছিলেন নিরহংকারী। এ মানুষটিকে ইতিহাস ভিন্নতা দিয়েছে তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। একজন সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হলো মানুষকে আপন করার শক্তি। সেই শক্তিগুণে তিনি চরম শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন, সহানুভূতি দিয়ে সংশোধনের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রাজনীতির দর্শনে ত্যাগ, ন্যায্যতা, সততা, সহমর্মিতা, ভালোবাসার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র-সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন চিরব্রতী। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সাধনা ছিল শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি মানবিকতা ও ভালোবাসাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করতে পারলে সামগ্রিক কল্যাণ সাধন একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে অধিকতর সহজ হয়।

সত্তরের নির্বাচনে স্লোগান ওঠে, 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা; আমার নেতা তোমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর ছিল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ এক অবিস্মরণীয় বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ঘৃণ্য চক্রান্তে আবারও বাঙালি জাতিকে তার রাজনৈতিক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এদিকে নির্বাচিত বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা করলে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৩ মার্চ দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক

ভাষণে বাংলার মানুষের চূড়ান্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির আহ্বান জানালেন। বজ্রকণ্ঠে বললেন, '... তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' একই প্রত্যয়ে উচ্চারিত তাঁর ঐতিহাসিক বাণী, '... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল ঘোষণা।

দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ব্যাংক, বিমা, পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প ও জাহাজশিল্প জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, 'খাই-খালাসি' আইন পাস; ব্রিজ, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ; অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, দক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, নাম-মাত্র মূল্যে বীজ সরবরাহ, ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা– এসবই ছিল বঙ্গবন্ধুর অবদান। তিনি বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতির জন্য বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আন্তরিক ও সকৃতজ্ঞ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিদায় দেন। মাত্র নয় মাসে তিনি দেশবাসীকে উপহার দেন গণতান্ত্রিক সংবিধান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় দেড় বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান সবকটি দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সমুদ্রসীমা আইন পাস করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আমাদের দেশের সব খনিজসম্পদ সরকারিকরণ করেন।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না– পারব না, পারব না।' কী নিবিড় ছিল বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা!

> বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলার মানুষ অন্ন পাবে, বাসস্থান পাবে, চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবে।' তাঁর জীবনে জনগণই ছিল প্রাণের উৎস

ইতিহাসের অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যের পর, দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তারপরও দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের পর তাঁর নেতৃত্বে এক দশক ধরে এগিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এক দশক ধরে ৬ শতাংশেরও বেশি হারে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটছে। তিন বছর ধরে তা বেড়েছে ৭ শতাংশেরও বেশি হারে। গত অর্থবছরে বেড়েছে ৭.৬৫ শতাংশ হারে। এ দশকে অবকাঠামো খাতে ব্যাপক হারে সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে (জিডিপির ৪.৩% থেকে ১২.২%)। পদ্মা সেতু, এলএনজি টার্মিনাল, মেট্রোরেল, পায়রা বন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র, চার লেনের রাস্তা, ফ্লাইওভারসহ ব্যাপক হারে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের শক্তিশালী পাটাতন নির্মাণ করেছে সরকার। গত এক শ বছরে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষম অবকাঠামো মাত্র ১০ বছরে

তিনগুণেরও বেশি উৎপাদনসক্ষম করে গড়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়ে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। গত এক দশকে অতি দারিদ্র্য কমেছে ১৭.৬ শতাংশ থেকে ১২.৯ শতাংশে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালের হিসাব থেকে তিনগুণ বেড়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা এখন স্বল্পোন্নত দেশের তকমা ঝেড়ে জাতিসংঘ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পরিচয়ের ছাড়পত্র পেয়েছি। আমাদের গড় আয়ু এখন ৭২.৫ বছর, যা একজন ভারতীয়র চেয়ে চার বছর এবং একজন পাকিস্তানির চেয়ে ছয় বছর বেশি। এক দশকে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৩৯ থেকে নেমে ২৮ হয়েছে এবং মাতৃমৃত্যুর হার হাজারে ২.৫৯ থেকে কমে ১.৭৮ জনে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখা চাই, ১৯৭২ সালে ৮ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির আকার এখন দাঁড়িয়েছে ২৮০ বিলিয়ন ডলার। এই দশকে ১৬ বিলিয়ন ডলারের রফতানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে বিশ্বের জন্য অনুসরণীয় একটি দেশ। তিনি বলেন, 'রূপকল্প-২০২১' সামনে রেখে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশকে পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)' প্রণয়ন করে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে– জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ২ হাজার ডলার। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৩৮ শতাংশ অর্জন। ইতোমধ্যে অর্জিত খাদ্যশস্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে টেকসই স্বয়ংসম্পূর্ণতায় রূপান্তর। ২০২১ সালের মধ্যে বাণিজ্য (আমদানি ও রফতানি) জিডিপির ৬০ শতাংশে উন্নীত করা। ২০২১ সালের মধ্যে মোট ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ২০২১ সালের মধ্যে সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা। ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ১৩.৫ শতাংশ নামিয়ে আনা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত বছরগুলোয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান বিষয় যেমন– মোট দেশজ আয়, প্রবৃদ্ধি, রফতানি আয়, কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি হ্রাস; সামাজিক খাতের দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু নিরাপত্তায় অগ্রগতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকারের সাফল্য অভূতপূর্ব।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের জাল ছিন্ন করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০১৬ সালের নমিনাল জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্বে ৪৬তম এবং ক্রয়ক্ষমতা সমতার জিডিপির ভিত্তিতে ৩৩তম স্থান লাভ করেছে।

অর্থনীতির আকার বিবেচনায় বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ৪২তম। ২০১৮ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়ে আলোচিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি হারে এগোবে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক গতি অব্যাহত থাকলে তিন বছরের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত হবে। ২০৩০ সাল নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদনের নিরিখে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলার মানুষ অন্ন পাবে, বাসস্থান পাবে, চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবে।' তাঁর জীবনে জনগণই ছিল প্রাণের উৎস। শেখ হাসিনার হাত দিয়ে আমাদের জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এবং দেশ একটি টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি।

লেখক: সহযোগী সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শতবর্ষে মুজিব

এলমা ওয়াজেদ

সম্মোহনিতা হচ্ছে অত্যাকর্ষণজনিত মোহিনীশক্তি, যা যুগে যুগে কোনো না কোনো ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পায়। এসব ব্যক্তিত্বের আঙুলের ইশারায় পৃথিবীর বুকে মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়। তাঁদের নেতৃত্বগুণে গোটা মানবজাতির মুক্তি আসে। ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ গুণাবলির এই সমন্বিত রূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে বিরাজমান। বিশ্বসম্মোহনীদের নামের তালিকায় আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্রে। তিনি সগৌরবে সম্মোহনিতার আসনে সমাসীন। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ হলো মুজিববর্ষ। বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের সন্তান তিনি। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বাবা-মা তাঁকে আদর করে 'খোকা' বলে ডাকতেন। ভাইবোন ও গ্রামবাসীর কাছে তিনি 'মিয়াভাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

<table>
<tr><th colspan="5">জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়</th></tr>
<tr><td colspan="5">বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বংশপরিচয়</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="5">দরবেশ শেখ আউয়াল
(হজরত বায়োজিদ বোস্তামি (রা.)-এর সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আগমন)</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="5">শেখ জহিরউদ্দিন</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="5">শেখ জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="5">শেখ বোরহানউদ্দিন</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td>↓</td><td colspan="2">↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">শেখ আকরাম</td><td>শেখ তাজ মাহমুদ</td><td colspan="2">শেখ কুদরতউল্লাহ্</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">শেখ অছিমুদ্দিন</td><td>শেখ আবদুল হামিদ</td><td colspan="2">শেখ আবদুর রহমান</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="5">শেখ লুৎফর রহমান (মৃত্যু: ৩০ মার্চ ১৯৭৫)</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="3">শেখ মুজিবুর রহমান
জন্ম: ১৭ মার্চ ১৯২০
নিহত: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫</td><td colspan="2">শেখ আবু নাসের
জন্ম: ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস
নিহত: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল</td></tr>
<tr><td colspan="5">↓</td></tr>
<tr><td>শেখ হাসিনা
জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭</td><td>শেখ কামাল
জন্ম: ৫ আগস্ট ১৯৪৯
নিহত: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫</td><td>শেখ জামাল
জন্ম: ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪
নিহত: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫</td><td>শেখ রেহানা
জন্ম: ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫</td><td>শেখ রাসেল
জন্ম: ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪
নিহত: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫</td></tr>
</table>

শৈশব

'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে।'

বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্টুপ্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)।

খেলাধুলাপ্রিয় শেখ মুজিবুর রহমান

একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে–

'আমার আব্বা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলা খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লাহাট যেতেন খেলতে। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন।'

শিক্ষাজীবন

শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালের পর ১৯২৯ সালে ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে তিনি আক্রান্ত হলে প্রায় চার বছর পড়ালেখা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪২ সালে মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে থাকতে শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকালে বৈরী অবস্থা সৃষ্টি হলে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র ছিলেন।

বেরিবেরি ও গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত

১৯৩৪ সালে বেরিবেরি এবং ১৯৩৬ সালে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন। এ সম্পর্কে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ রয়েছে– '১৯৩৪ সালে যখন আমি ৭ম শ্রেণিতে পড়ি, তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যান। কলকাতার বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন।'

'১৯৩৬ সালে আবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে পড়ে। গ্লুকোমা নামে একটা রোগ হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে আব্বা আবার আমাকে কলকাতায় রওয়ানা হলেন। অপারেশন করা হলো, আমি ভালো হলাম। তবে কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ। চশমা পরতে হবে। সেই ১৯৩৬ সাল থেকে চশমা পরছি।'

বিবাহ

'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন, 'আব্বার যখন দশ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র

তিন বছর। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স, তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে।'

মুসলিম সেবা সমিতি

বঙ্গবন্ধুর একজন স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তোলেন, যার সদস্যরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, চাল, টাকা জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। বঙ্গবন্ধু সেই দলের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে জানা যায় যে– তাঁর জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কেনা লাগত। কারণ কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন।

প্রথম বিদ্রোহ

'কৈশোরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর শেখ মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন', 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

কারাজীবন

বঙ্গবন্ধু সারাজীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে ৪৬৭৫ দিন। বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮ সালে প্রথম কারাগারে যান।

পাকিস্তান শাসনামল

১৯৪৭ সাল। ইতিহাসের এক অনন্য বছর। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে খণ্ডিত হয়ে গঠিত হলো ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতাদানের কথা ঘোষণা করার পরপরই বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের 'সিরাজদ্দৌলা হলে' ছাত্র ও যুবনেতাদের নিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। ওই সভায় তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ স্বাধীনতা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। বাংলার মাটিতে নতুন করে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে আমার এই আশঙ্কা হচ্ছে।' ('বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রবল বিরোধিতার মুখে অগণতান্ত্রিক নীতির প্রতিবাদে রোজ গার্ডেনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগবিরোধী প্রথম রাজনৈতিক কর্মিসম্মেলন। পরে সেখানেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর যুগ্ম সম্পাদক। শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে। তাঁর বিপ্লবী নেতৃত্ব ও মহান আত্মত্যাগের কথা বিবেচনা করে তাঁর অনুপস্থিতিতেই নবগঠিত দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় তাঁকে। পরে নামকরণ করা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। ১৯৫০ সালে নিরাপত্তা আইনে হন কারাবন্দি। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারিতে গঠিত সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সভায় জননেতা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গৃহীত হয়েছিল একটি প্রস্তাব। কয়েক মাস ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন শেখ মুজিব। চিকিৎসার জন্য সরকার ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে স্থানান্তরিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মুক্তির দাবিতে অনশন ধর্মঘট করবেন, এ কথা শেখ মুজিব জানিয়ে দিয়েছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারিতে মুক্তিদান করে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৫২ সাল মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামের শুরু হয়েছিল, এর শহিদের রক্তধারা সেই আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং এর চরম ও পরম লক্ষ্য গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনে জয়যুক্ত হয়ে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অর্জন প্রকৃত স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটে বাংলা ভাষাভিত্তিক প্রথম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে– এই মর্মে সরকার ঘোষণা করে। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী, ১৪ জন সদস্যের মধ্যে। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিব সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে জননেতা শেখ মুজিব পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জ্ঞাপন করে বলেন:

> 'Give us full religion autonomy... Write down that Bengali will be one of the state languages...' আরও বলেন, 'We want to speak in Bengali here whether we know any other language on not it matters little for us... It that is not allowed, We will live the House but Bengali should be allowed in this House; that is our stand.'

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সামরিক শাসনোত্তর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে গ্রহণ করা হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করা হয় ছয় দফা কর্মসূচি। এ কারণে ছয় দফাকে স্বাধিকার সনদ বলা হয়।

ঐতিহাসিক ছয় দফা নিম্নরূপ

১. সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সার্বভৌম সংসদসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার।
২. দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অবশিষ্ট সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে।
৩. দেশের দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা থাকবে।
৪. কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশলাভ করবে।
৫. কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে মিল রেখে আঞ্চলিক সরকারগুলো বিদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে এবং যে কোনো বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনা করতে পারবে।
৬. আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। অতীতের অগণতান্ত্রিক শাসন যেন আর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য প্রথম দফাতেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল– 'লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে মিথ্যা নামকরণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ থাকলেও তাঁকে করা হয় প্রধান আসামি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনসত্তরের গণআন্দোলনকে রূপান্তরিত করে গণঅভ্যুত্থানে। সেই সঙ্গে শেখ মুজিবকে প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব পাকিস্তানের একক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে।

গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে শপথ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারিতে গণতন্ত্র, বন্দিমুক্তি ও ছাত্রসমাজের দাবি আদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ১৪ জানুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১১-দফা কর্মসূচি। ২০ জানুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুরোনো কলা ভবন ও বর্তমানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন ইনস্টিটিউটের সম্মুখে রাস্তায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের একপর্যায়ে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের গুলিতে নিহত হন আসাদুজ্জামান আসাদ। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারাদেশে উত্তাল গণবিক্ষোভে উত্তপ্ত স্লোগান: 'জেলের তালা ভাঙবো; শেখ মুজিবকে আনবো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নাও, তুলে নাও; জাগো জাগো, বাঙালি জাগো'। ২১ ফেব্রুয়ারি শেষ প্রহরে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় শেখ মুজিব ও তাঁর সহবন্দিদের।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দানের প্রস্তাব করলে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনসমুদ্র বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচন বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে জাতীয় পরিষদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্লোগান ছিল– 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা', 'তোমার নেতা, আমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রমাণিত হন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শপথনামা পাঠ করান।

৭ মার্চ ১৯৭১

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ মার্চ এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টিকারী ভাষণগুলোর অন্যতম ৭ মার্চের ভাষণ। বাঙালির হাজার বছরের ইতহাসে বাঙালি জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে বিশ্বসভায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে এই ভাষণে। আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালে প্রদত্ত বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিক-নির্দেশনামূলক ৭ মার্চের ভাষণ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বিশাল জনসভায় সমবেত মুক্তিপাগল দেশবাসীকে 'ভাইয়েরা আমার' বলে তিনি সম্বোধন করেন। ভাষণের শুরুতে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়।' মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' স্বাধীনতা-

সংগ্রামের এই আহ্বানের জন্য ৭ মার্চের ভাষণকে 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত। News week পত্রিকা ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল সংখ্যায় ভাষণটির জন্য বঙ্গবন্ধুকে Poet of politics বলে আখ্যায়িত করেছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরের শেষে ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ অর্থাৎ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতা ইতিহাসের ভয়াল এক রাত। ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। এই রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অন্ধকারে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালির ওপর। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষারূপ দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি যে বাণী প্রদান করেন তার অংশবিশেষ এরূপ:

> 'This may be my last message from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you may be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর থেকে শপথ গ্রহণ করা হয়। বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করা হয়। মুজিবনগর হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ এপ্রিল বেতারের মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। ১১টি সেক্টরে পুরো বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়। কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে রেখে ১১ আগস্টে তাঁর বিচার শুরু করে সামরিক আদালতে। আন্তর্জাতিক চাপে তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। একই দিনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সংবিধান

১২ জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। বিচারপতি আবু সাঈদ মনোনীত হন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় সংবিধান তৈরির কাজ। ১৯৭২ সালে সংবিধান চূড়ান্ত রূপ নিলে চালু হয় চার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা:

ক. ধর্মনিরপেক্ষতা
খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
গ. গণতন্ত্র
ঘ. সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রণীত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাতির পিতা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার সময়কাল ছিল ১৯৭৩-১৯৭৮।

জুলিও কুরি শান্তি পদক

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডিয়াম সম্মেলনে 'বিশ্বের জনগণের সংগ্রামের অনন্য সহযাত্রী শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক ভূষিত হন 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। ১৩৬ নম্বর সদস্য হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ভাষণ দেন, যা ছিল শান্তিকামী উন্নত আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সপক্ষে একটি স্মরণীয় দলিল।

বাকশাল

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। শোষিতের গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশাল গঠনের আছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। পরম শোকের দিন। তাঁর হত্যাকারীরা দিনক্ষণ এমনভাবে নির্ধারণ করেছিল যাতে কেউ ধরতে না পারে। ঘাতকরা তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করে নির্মমভাবে। শেখ নাসের মৃত্যুর আগে পানির জন্য চিৎকার করতে থাকলে তাঁকে পানির বদলে গুলি করে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষীদের অনেকেই দিয়েছেন।

শেখ ফজিলাতুননেছার অবদান

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
–কাজী নজরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুর জীবনে 'বিজয় লক্ষ্মী নারী' হিসেবে এসেছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব। জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল তাঁর। কারাগারে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করতেন তিনি। নিজ সম্পত্তি দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতেন। প্রয়োজনে আসবাবপত্র, অলংকার বিক্রি করেও পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। হয়ে উঠেছেন বাঙালি জাতির মমতাময়ী মা।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

২০০৪ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে খুঁজে বের করে বিবিসি। যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল।

তরুণদের শেখ মুজিবুর রহমান

তরুণদের উজ্জীবিত করার মাধ্যমে ঈর্ষণীয় এক অগ্রগতির মূলমন্ত্র শিখিয়ে গেছেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় দীক্ষিত। তিনি যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বারবার বলে গিয়েছিলেন, আজ আমরা সেই মুক্তির অর্জনের পথে। তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন, থাকবেন।

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স

অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু

কেবল রাজনৈতিক নেতা নন, অসাধারণ রসবোধ আর স্মরণশক্তির জন্যও বঙ্গবন্ধু আলোচিত। এখানে তাঁর জীবন থেকে নেওয়া এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলো, যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে অন্য এক বঙ্গবন্ধুকে। **সংগ্রহ– পপি দেবী থাপা**

মনে আছে, একবার একদল লোক ঢুকে গেল তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) ঘরে। তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তিনি বছর তিরিশেক বয়সের এক যুবককে বললেন–

: তুমি অমুকের পোলা না?

যাকে কথাটা বলা হলো, তিনি রীতিমতো হতবাক। বললেন–

: আপনি জানলেন কী করে? উনিই তো আমার আব্বা।

: আমি জানব না ক্যান? ছেষট্টি সালে বরিশালে তোমাগো বাড়িতে গেছিলাম। বাড়ির সামনে একটা বড়ো আমগাছ ছিল তখন। এখনো আছে সেই গাছটা? আমার সব মনে আছে। তোমারে তখনই দেখছি। তুমি ছোটো ছিলা।

কত বছর আগের ঘটনা। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো– বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামে-গঞ্জে কত স্থানে গেছেন তিনি। সেসব অসংখ্য স্থানের কোনো একটির স্মৃতি এভাবে মনে রাখা সত্যি কি সম্ভব? যারা বঙ্গবন্ধুকে জানতেন, তারা এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন।

(মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর)

মালা দিলেন, মালা পেলেন বাদশা মিয়া

'চট্টগ্রাম থেকে বাদশা মিয়া সওদাগর নামে একজন ব্যবসায়ী বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানাতে একটা বড়োসড়ো ফুলের মালা নিয়ে গণভবনে এলেন। নাদুসনুদুস মোটা চেহারার ভদ্রলোক। আমি চট্টগ্রামে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্রে তিনি আমার অফিসকক্ষে এসে বসলেন।

চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে আমি জানালাম, সাক্ষাৎকারের বিষয়টি একান্ত সচিবের এখতিয়ার। আপনি ফরাসউদ্দীন সাহেবের কাছে যান।

তিনি জানালেন একান্ত সচিব ফরাসউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু একান্ত সচিব তাকে অপারগতা জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দনসূচক ফুলের মালা দেওয়া গতকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আর কিছু করা যাবে না।

আমি ফরাসউদ্দীনকে ইন্টারকমে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে একই উত্তর পেলাম।

বাদশা মিয়া সওদাগর মন খারাপ করে বললেন, আমার কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল।

: মানে?

: আজ ক'দিন থেকে আমি পূর্বাণী হোটেলে আছি। একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে মালা পরাব।

: আপনি গতকাল এলেই তো পারতেন, আমি বললাম।

: গতকালই আসতাম। কিন্তু একটা ভালো ফুলের মালা জোগাড় করতে পারিনি। আজ এটা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছি।

ভদ্রলোকের দুঃখ আমাকে ভারাক্রান্ত করল। আমি তাকে চা ও মিষ্টি সহযোগে সমবেদনা জানালাম।

ইতোমধ্যে ইন্টারকম বাজল। অপরপ্রান্ত থেকে ফরাসউদ্দীন বললেন, আপনার মেহমান কি চলে গেছেন?

: না। আমার সামনেই আছেন।

ওকে বঙ্গবন্ধুর অফিসের সামনে যেতে বলুন। কুমিল্লা থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীদের একটা দল এসেছে। এত দূর থেকে আসায় বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হয়েছেন। বাদশা মিয়া তাদের সঙ্গে ভেতরে যেতে পারেন।

আমি বাদশা মিয়া সওদাগরকে বিষয়টা বলতেই তিনি ফুলের মালাটা নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে বাদশা মিয়া আবার আমার ঘরে এসে উপস্থিত। ফুলের মালাটি তার গলায় শোভিত। বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

: কী ব্যাপার! কিছুটা বিব্রত হয়ে বললাম, আপনি কি মালা দিতে পারেননি?

মালা দিয়েছি। খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বাদশা মিয়া জানালেন, 'বঙ্গবন্ধুকে মালাটি পরিয়ে দিতেই তিনি মালাটি গলা থেকে খুলে আবার আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়?'

বাদশা মিয়ার চোখে-মুখে আনন্দ। তার আনন্দে আমিও আনন্দিত। বললাম, 'যাক। আপনার এত টাকা খরচ করে ঢাকায় আসা ও থাকা সার্থক হলো।'

তিনি বললেন, 'টাকার জন্য ভাবি না, বঙ্গবন্ধু আমার নাম জেনেছেন, আমাকে চিনেছেন, ব্যাস! এতেই আমার কাজ হয়েছে। এখন থেকে সারাজীবন তিনি আমাকে মনে রাখবেন। তিনি একবার কাউকে দেখলে কখনো তাকে ভোলেন না। আমিও যদি ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি চিনতে পারবেন। টাকা দিয়ে এটুকু পাওয়া যায় না।'

কথা শুনে সবিস্ময় তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলব, ভেবে পেলাম না।

বাদশা মিয়া বললেন, 'মালাটা আপনাকে দিয়ে যাই?'

: না, না। আমাকে কেন? আপনি বরং মালাটা নিয়ে যান। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে পারবেন।

: তা-ই ভালো।

বাদশা মিয়া সওদাগর মালা গলায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

(মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর)

মানচিত্রের মাস্টার

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা এসেছিল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। কথা বলতে বলতে তিনি দেওয়ালে ঝোলানো বিশ্বমানচিত্রের কাছে উঠে গেলেন। বললেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কি জান? এর জনসংখ্যা।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আসো তোমাগো পড়াই।

একটা কাঠি দিয়ে মানচিত্রের ওপর বিভিন্ন দেশের দিকে নির্দেশ করতে করতে বঙ্গবন্ধু ওইসব দেশের লোকসংখ্যা মুখস্থ বলে গেলেন। আমরা সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আবার বললেন, মাস্টার হইলে ভালো করতাম। বুঝলা?

আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তির অধিকারী বঙ্গবন্ধু। একজন মানুষের পক্ষে কতজন মানুষকে নামে ও চেহারায় চেনা সম্ভব জানি না। একেক সময় মনে হতো, যাকে একবার তিনি দেখেছেন, তাকে জীবনে তিনি কখনো ভোলেন না।'

(মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর)

জহুরের কাঁধে জন্মনিয়ন্ত্রণ

নিজের মন্ত্রীদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই রসিকতা করতেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর বিকেলবেলা সংবাদ সম্মেলন করার পর যথারীতি আমাদের সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডায় বসলেন। তখনও মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন হয়নি। এ নিয়ে আমরা একটুখানি কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি কৃত্রিম গম্ভীরতার সঙ্গে জানালেন–

: সব এখন বলব না, একটু পরেই জানতে পারবা। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যথাযথ দায়িত্ব দিয়েছি। তবে একটা দপ্তর নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে সেটা জহুরের কাঁধে চাপালাম। দপ্তরটি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ (পরবর্তীকালে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)। ভেবে দেখলাম, আমার মতো সারাজীবন জেল খাইটা তার শরীরডা খ্যাংরা কাঠির মতো হইয়া গেছে। সব ডাক্তারকে সে মাইনষের স্বাস্থ্য ভালো করার তাগিদ দিতে পারব। সে আবার দুই বউয়ের ১৪টি বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাইতাছে। বেশি বাচ্চা হওয়ার জ্বালা সে-ই ভালো বোঝে। তাই তারে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছি।'

এই 'জহুর' হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর জহুর আহমদ চৌধুরী। জহুর আহমদ চৌধুরীকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিচ্ছেন যোগ্যতম মানুষ ভেবেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রঙ্গরস করতেও ছাড়েননি। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে পাই অতুলনীয় আরেক বঙ্গবন্ধুকে। ব্যক্তি, প্রশাসক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা– সবক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন এভাবেই।

হেডেড বাই শেখ

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সিলেটের ভূ-অভ্যন্তরে গ্যাস আগেই পাওয়া গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে কতিপয় বিদেশি কোম্পানি এসেছে

গ্যাস অনুসন্ধানে। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী, খনিজসম্পদমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও। বৈঠক শেষে গণভবনের পূর্ব বারান্দায় যথারীতি বসেছে আড্ডা তথা খোশগল্পের আসর। সেখানে একটু আগে সম্পন্ন হওয়া বিদেশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গটি এলো। বঙ্গবন্ধু বললেন–

: কয়েকটি বিদেশি অনুসন্ধান কোম্পানিকে আমি বলেছি, শুধু গ্যাস নয়, আমাদের তেলও আছে। তারা জানতে চাইল,

: এ নিয়ে অতীতে কোনো অনুসন্ধান হয়েছে কি না। আমি বলেছি–

: তা হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত, আমাদের তেল আছে। আরব দেশগুলোর তেল পাওয়ার যে দুই ক্রাইটেরিয়া তথা যথার্থতা রয়েছে, তা আমাদেরও আছে।'

> একটা কাঠি দিয়ে মানচিত্রের ওপর বিভিন্ন দেশের দিকে নির্দেশ করতে করতে বঙ্গবন্ধু ওইসব দেশের লোকসংখ্যা মুখস্থ বলে গেলেন। আমরা সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন–

: কিছু বুঝলা?

আমরা দুদিকে ঘাড় নাড়লাম। বঙ্গবন্ধু কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে বললেন–

: আমি তাগোরে বইলাছি, তেল পেতে হলে দেশটির দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যা আমাদের আছে।

এক. মুসলিম দেশ হতে হবে।

দুই. ইট মাস্ট বি হেডেড বাই শেখ। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানকে শেখ হতে হবে।

কথাগুলো বলে দিলখোলা বঙ্গবন্ধু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

(এবিএম মূসা, 'মুজিব ভাই' গ্রন্থ থেকে)

যা লেখাবার সন্ধ্যার আগে লেখাবি

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু আমাকে প্রথমে টেলিভিশনের মহাপরিচালক, পরে 'দৈনিক মর্নিং নিউজ'-এর সম্পাদক করলেন। ইংরেজি দৈনিকটা ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি, সাংবাদিক-কর্মচারী অবাঙালি যারা ছিলেন, তাদের অনেকে আগেই পাকিস্তানে চলে গেছেন। ইংরেজি লেখার সাংবাদিক নেই। এরই মধ্যে একদিন আমার বন্ধু জ্যাক-জাকারিয়া খান চৌধুরী, পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা– দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর স্বাধীন বাংলাদেশে চলে এলো, সঙ্গে স্ত্রী স্থপতি শামীম শিকদার। সে একদিন আমার দপ্তরে এসে বলল,

: দোস্ত, ফিরে এসেছি, এখন চাকরি দে।

জ্যাক খুব ভালো ইংরেজি জানত। তাকে 'মর্নিং নিউজ'-এর সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ দিলাম।

এরপর একদিন বিকেলে তাকে বললাম–

: দোস্ত, চলো গণভবনে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।'

বস্তুত তখন প্রতিদিন পুরোনো গণভবনে, বর্তমান 'সুগন্ধা'র পেছনের বারান্দায় সন্ধ্যায় মুজিব ভাই আমাদের অনেকের সঙ্গে গালগপ্প করতেন। জ্যাক পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াতেই মুজিব ভাই বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন–

: এটাকে আবার কে নিয়ে এলো?

উল্লেখ্য, জ্যাকের সিলেটের বনেদি পরিবারের সবাইকে বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। আমি বললাম–

: জ্যাক ফিরে এসেছে, ওকে আমার কাগজে নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বললেন–

: তা ওর কাজ কী?

বললাম, সম্পাদকীয় আর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপসম্পাদকীয় লিখবে। শুনে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন,

: বেশ ভালো।

তারপর স্বভাবজনিত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন–

: যা লেখাবার সন্ধ্যার আগে লেখাবি। খবরদার, সন্ধ্যার পরে যেন কিছু না লেখে।

ইঙ্গিতটা বুঝে জ্যাক লজ্জায় লাল। আর আমরা তো হো-হো করে হেসে উঠলাম। প্রধানমন্ত্রীর পরিহাসটি ছিল জ্যাকের প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ পানীয় পানের কারণে বেহাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

(বঙ্গবন্ধুর হাস্যরসপ্রিয়তার এই ঘটনাটিও জানিয়েছেন তাঁর প্রিয়ভাজন সাংবাদিক এবিএম মূসা)

এক শাড়ি দুই বউ

ঘটনাটি বাহাত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময়ের। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠান শেষে তিনি ১৪ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেকের হাতে উপহারস্বরূপ একটি করে ভারতীয় ব্যাঙ্গালুরু সিল্কের শাড়ি দিলেন। বলা বাহুল্য, শাড়িগুলো মন্ত্রীদের বেগম সাহেবদের জন্য। শাড়ি বিতরণ শেষ, মন্ত্রীরা ইন্দিরা গান্ধীকে সমবেতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এমন সময় দূর থেকে এগিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের শাড়ি প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে জহুর আহমদ চৌধুরীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ইন্দিরাজি অবাক হয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন–

: মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ। তাঁর শাড়ির দরকার নেই। বেচারা জহুরের দুই বউ। এক শাড়ি নিয়ে দুজনে টানাটানি করবে। তাই তাঁরটি জহুরের আরেকটি বউয়ের জন্য দিলাম।

(এবিএম মূসা, 'মুজিব ভাই' গ্রন্থ থেকে)

ফেরেশতা কো তোমলোক খুন কিয়া

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দুই দিন পর। বঙ্গবন্ধু একদিন পুরোনো গণভবনে আমাকে বললেন, হ্যাঁ রে সবাইকে দেখলাম, বদরুদ্দিন ভাই কোথায়? বদরুদ্দিন মানে তৎকালীন পাকিস্তানি মালিকানার ট্রাস্টের পত্রিকা মর্নিং নিউজের সম্পাদক। পত্রিকাটি অহর্নিশ তাঁর কুৎসা গেয়েছে, আগরতলা মামলার সময় তাঁর ফাঁসি দাবি করেছে। এই সেই পত্রিকা, যার অফিস বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণ পুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে অহর্নিশ বিষোদ্গারকারী সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কমতি ছিল না। তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন, 'কোথায় আছেন বদরুদ্দিন ভাই? খুঁজে নিয়ে আয়। ভালো আছেন তো? কোনো অসুবিধায় নেই তো?'

বঙ্গবন্ধুর আদেশে বদরুদ্দিনকে খুঁজতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম, লালমাটিয়ার একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। বহু কোশেশ করে দেখা করলাম। বললাম, 'মুজিব ভাই আপনাকে খুঁজছেন। চলুন আমার সঙ্গে।' বদরুদ্দিন ভাইয়ের চোখ-মুখ যেন ঝলসে উঠল, 'ক্যায়া, শেখ সাব মুঝে বোলায়া, আই ক্যান গো টু হিম, সি হিম? নিয়ে এলাম তাকে গণভবনে, যেন দুই বৈরী নয়, যেন দুই বন্ধুর মিলন দেখলাম। বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পাশে বসালেন। নেতা জিজ্ঞেস করলেন–

: 'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ। আপনি কী করতে চান? কাহা যাতে চাহে? কোনো বিপদে নেই তো?' আবেগময় প্রশ্নগুলো শুনে বদরুদ্দিন আধো কান্না আধো খুশি মেশানো কণ্ঠে বললেন–

: পাকিস্তানে যেতে চাই, মে আই লিভ ফর করাচি? বঙ্গবন্ধু একান্ত সচিব রফিকউল্লাহকে ডাকলেন: বদরুদ্দিন ভাই যা চান, তা-ই করে দাও।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাকিস্তান তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের সঙ্গেও নৌ-স্থল-বিমান যোগাযোগ নেই। কিছু অবাঙালি গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও কাঠমান্ডু হয়ে তারপর পাকিস্তানে যাচ্ছে।

বদরুদ্দিন ভাইয়ের আরেকটি প্রার্থনা, আসাদ এভিনিউয়ের বাড়িটি বিক্রি করবেন, সেই টাকাও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাহাত্তরে সেই সময়ে একজন বিহারির এহেন একটি আবদার কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেন তথাস্তু, তা-ই হবে।

ক্রেতা ঠিক হলো আতাউদ্দিন খান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সহায়তায় সচিব আতা সাহেব বাড়ি কিনে যে টাকা দিয়েছিলেন, তা বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বাইরে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর (বর্তমানে প্রয়াত) হামিদুল্লাহ সাহেবকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর বদরুদ্দিন স্বচ্ছন্দে নেপাল হয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন।

পঁচাত্তরের অনেক বছর পর লাহোরে বদরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলছিলেন, 'আল্লাহর শোকর, শেখ সাহেব ফিরে এসেছিলেন। তাই তো বেঁচে আছি। এখনো বহাল তবিয়তে আছি।'

তারপরই মাথা থাবড়াতে থাকলেন, 'ইয়ে ফেরেশতা কো তোমলোক খুন কিয়া?'

বঙ্গবন্ধুর বিশাল হৃদয়ের এই প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন সাংবাদিক এবিএম মূসা তাঁর 'মুজিব ভাই' গ্রন্থে।

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধীনতার স্বপ্নসারথি

মো. মিনহাজ উদ্দীন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন মানুষ। একজন অসীম সাহসী, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক, রাজনীতির কবি (Poet of Politics)। শরীরে টুঙ্গিপাড়ার পলিমাটির প্রলেপ মেখে বড়ো হওয়া একজন 'খোকা' অনন্যসাধারণ ও চিরস্মরণীয় এক বিশেষ অবদানের জন্য। পদে পদে জীবন বিপন্ন করে, স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালিয়ে, সমঝোতার সিংহাসনকে পাশ কাটিয়ে একটি জাতিকে তিনি স্বাধীন করার সাহস দেখিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। এটাই একজন শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অর্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশ গণতান্ত্রিক রীতি মেনে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা পূর্ব বাংলার রাজনীতির মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, অলি আহাদ, মোজাফ্ফর আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা আর অন্য বলয়ের ফজলুল কাদের চৌধুরী, নুরুল আমিন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আরও কতক প্রভাবশালী রাজনীতিক। কিন্তু তারা কেউ-ই সেই সময়ের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। দিতে পারেননি মুক্তির দিশা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, সেই সূর্যকে নতুন করে পূর্ব দিগন্তে নব মহিমায় উদিত করার স্বপ্ন দেখাতে পারেননি কেউ-ই। আর এখানেই ব্যতিক্রম একজন শেখ মুজিব। উল্লেখ করা যেতে পারে, শেখ মুজিবুর রহমানের

রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও একটি স্বাধীন দেশের কথা কখনো ভাবেননি। ১৯৫৬ সালের সেপ্টম্বরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁকে একজন সংবাদিক পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছিলেন, তাঁর (সোহরাওয়ার্দী) প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্ধেক পূরণ হয়ে গেছে। (আহমদ: ২০১৬)। এই জায়গায়ই একজন মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অনন্য। অসীম সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শেখ মুজিব অবিচল ছিলেন মানুষের অধিকার আদায় তথা স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে। নিজের ব্যক্তিগত কোনো অর্জনের মধ্যে তিনি বাঙালি জাতির প্রাপ্তি দেখেননি, বরং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অর্জন ও অগ্রগতিতে দেখেছেন নিজের সফলতা ও রাজনীতির সার্থকতা। যেখানে অন্য নেতারা ছিলেন পলায়নপর ও সমঝোতাবাদী।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারকারী ঘটনা। যার প্রভাব এই অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিতে এখনো স্পষ্ট। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ শেখ মুজিবুর রহমানকেও ভাবিয়েছিল। অস্বাভাবিক, কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাঙালির অধিকার আদায় ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে শুরু থেকেই তাঁর সংশয় ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ফেরেন শেখ মুজিব। শুরু হয় নতুন পথচলা। ওই সময় থেকেই তিনি নতুন কিছু করার, নতুন করে কিছু করার চিন্তা করছিলেন। দেশের মানুষও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন আসে ১৯৫২ সালে চীন সফরের পর। ১৯৫২ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে পিকিং সফর করেছিলেন শেখ মুজিব। ওই সফরে সাংহাই, নানকিং, হ্যাংচোসহ বেশ কয়েকটি চীনা শহর দেখার সুযোগ হয়েছিল শেখ মুজিবের। মাও সেতুংয়ের নয়াচীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও অগ্রগতি শেখ মুজিবকে বিস্মিত করে। সঙ্গে নয়া পাকিস্তানে বাঙালিদের প্রতি অবহেলা আর অবজ্ঞা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে (২০১২)। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন:

'আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালে আর চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। যে মনোভাব পাকিস্তানের জনগণের ছিল, স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে আজ যেন তা ঝিমিয়ে গেছে। সরকার তা ব্যবহার না করে তাকে চেপে মারার চেষ্টা করেছে। আর চীনের সরকার জনগণকে ব্যবহার করেছে তাদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে। তাদের সাথে পার্থক্য হল, তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ এবং এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন। ফলে দেশের জনগণের মধ্যে ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। একমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সাদা চামড়ার জায়গায় কালা চামড়ার আমদানি হয়েছে' (রহমান, ২০১২: ২৩৪)।

শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুতই বুঝতে পারেন স্বাধীনতার নামে পাঞ্জাবি আমলাতন্ত্র বাঙালিদের ওপর চেপে বসেছে। শুরু হয়েছে লুটপাট আর শোষণের আরেক অধ্যায়। শুরু থেকেই এই শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ভাষার প্রশ্নে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনে শেখ মুজিব ছিলেন সামনের কাতারে। বায়ান্নতে তীব্র আন্দোলন ও ছাত্রদের ওপর গুলি চললে কারাগারের ভেতর থেকেই এর প্রতিবাদ করেন। ভাষা আন্দোলনের দুই বছরের মধ্যে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। আবেগ আর অর্থনৈতিক অধিকারের ২১ দফাভিত্তিক ওই নির্বাচন মুসলিম লীগকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোণঠাসা করে ফেলে (৩০০ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের আসন মাত্র ৯টি)। তবে নির্বাচনে জয়লাভের পর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করার আগে থেকেই শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। মন্ত্রিসভার শপথের দিনই আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় ব্যাপক রক্তক্ষয় হয়। অন্যদিকে প্রশাসনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বাঙালি কর্তৃত্বের আতঙ্ক, যা মোকাবিলায় তেমন কোনো কঠোরতা ও প্রজ্ঞা দেখা যায়নি ওই সময়ের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার করাচি থেকে ৯২(ক) ধারা জারি করে। আর মাত্র ১৫ দিনের মাথায় বাতিল হক মন্ত্রিসভা (১৫ মে-২৯ মে ১৯৫৪)। তখন মওলানা ভাসানী লন্ডনে আর চিকিৎসার জন্য জুরিখে সোহরাওয়ার্দী। ফজলুল হক গৃহবন্দি। এরপরও দেড় ডজন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য বাইরে ছিলেন। তাদের কেউ সেই সময় পাকিস্তান সরকারের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেননি। সবাই চুপচাপ, ভীত। মন্ত্রিসভা বাতিলের পর গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে আসেন অবাঙালি ইস্কান্দার মীর্জা। যার মন জুগিয়ে চলতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করেন বাঙালি নেতারা। বাংলার বাঘ (শের) ফজলুল হক তাকে 'খাঁটি বাঙালি' হিসেবে আখ্যা দেন! (মুরশিদ: ২০১০)।

এমন আপসকামী পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি মনে করেছিলেন, এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ হওয়া জরুরি। তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, সবাই সমঝোতার পথে হাঁটলেও শেখ মুজিব কারাবরণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন (প্রথম আলো: ২০১৭)। কারাগারের সেলই হয়ে উঠেছিল তাঁর ঘরবাড়ি। ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের এই কারাবরণের কাহিনি অনেকটা কিংবদন্তিতুল্য। ৯২(ক) ধারা জারির পর দেশে থাকা শীর্ষ নেতারা ছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে, আত্মগোপনে। কিন্তু শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়ে স্থাপন করেছিলেন অনন্য নজির। নিজেকে গ্রেফতারের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি গাড়ি পাঠিয়ে দেন।' (রহমান, ২০১২: ২৭১)।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় যেমন এদেশের রাজনীতিতে অনন্য ঘটনা, ঠিক তেমনি চাপের মুখে পলায়নপর হওয়া, লাঠি-বন্দুকের মুখে সমঝোতামুখী হওয়ার নেতিবাচক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলেন বাঙালি শীর্ষ রাজনীতিবিদরা। যে বিষয়টি ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল শেখ মুজিবকে। তাই তো তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'নীতিবিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।' (রহমান, ২০১২: ২৭৩)।

নীতিবিহীন শীর্ষ নেতারা যখন ভবিষ্যৎ স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টায় মশগুল– এমন সময়ই জারি করা হয় সেনাশাসন। প্রথমে ইস্কান্দার মীর্জা, পরে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে শুরু হয় ধরপাকড়। রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে স্থবিরতা। এই স্থবিরতা চলে কয়েক বছর। তবে ষাটের দশকের শুরুতে ছাত্ররাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিশেষ গতি পায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন এবং তাতে সেনা কর্তৃপক্ষের বাধায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। এদিকে আইয়ুব খানের কড়া সেনাশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। মাঝে ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৬৫ সালের

পাক-ভারত যুদ্ধের পর নতুন কর্মসূচি নিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে হাজির হন শেখ মুজিব। উল্লেখ্য, লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর রহস্যজনকভাবে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চলে আসেন শেখ মুজিব। দলটির মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ও সাহসী নেতাদের প্রতিনিধি। যারা পুরোনো ধ্যানধারণার বাইরে গিয়ে বাঙালির অধিকার আদায়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলেন। নতুন দিনের, নতুন সম্ভাবনার এই রাজনীতির শুরুতেই ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ঘোষণা করেন তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, যা পরবর্তী সময়ে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এতে পুরো পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। আইয়ুব খান হুমকি দেন 'অস্ত্রের ভাষায়' এই কর্মসূচি নস্যাৎ করার। শেখ মুজিবুর রহমানের এই ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকনির্দেশনা ছিল। ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার। নানা দিক থেকে ছয় দফা একটি সমন্বিত, সুচিন্তিত রাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও অনেকেই এই কর্মসূচির বিরোধিতা করেন। এমনকি ওই সময়ের বুদ্ধিজীবীরাও ছয় দফাকে ভালোভাবে নেয়নি। শুধু ছাত্রলীগ এই ছয় দফাকে 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) বা অধিকারের দলিল হিসেবে গ্রহণ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান নানা কর্মসূচিতে ছয় দফাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। দিনরাত সভা-সমাবেশ, কর্মিসভা ও জেলা পর্যায়ের সভা করে জনমত তৈরি করেন। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষের জনমত গঠিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, ছয় দফাকে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দৈনিক ইত্তেফাক বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ছয় দফা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে তেমন আর কেউ ছিলেন না। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আতাউর রহমান খান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। পাকিস্তানপন্থি, ডানপন্থি বা জিন্নাহ্‌পন্থি রাজনীতিকরা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের জোয়ারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। মওলানা ভাসানী খণ্ডিত ন্যাপ নিয়ে নিজের মতো করে দল গোছানোর চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু প্রভাব ছিল সীমিত। মস্কোপন্থি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফরের রাজনৈতিক প্রভাবও ক্ষয়িষ্ণু। এমন বাস্তবতায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ছয় দফাকে প্রধান সমস্যা (বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি) হিসেবে বিবেচনা করে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। ১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় লম্বা কারাজীবন। এ দফায় তাঁকে খুব সামান্য, নগণ্যসব মামলা দিয়ে কারাগারে আটকে রাখা হয়। জামিন হওয়ার পর জেলগেটেও আটক হন। এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানে বিরুদ্ধে শুরু হয় আরেক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে ১ নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে আইয়ুব খানের সরকার (মুরশিদ: ২০১০)।

> শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুতই বুঝতে পারেন স্বাধীনতার নামে পাঞ্জাবি আমলাতন্ত্র বাঙালিদের ওপর চেপে বসেছে। শুরু হয়েছে লুটপাট আর শোষণের আরেক অধ্যায়। শুরু থেকেই এই শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখ মুজিবুর রহমান

একজন সাহসী শেখ মুজিব, যিনি জীবনভয়কে তুচ্ছ করে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের কথা চিন্তা করেছেন, বাংলার মানুষের মুক্তির চিন্তা করেছেন, তার প্রতিফলন পাওয়া যায় 'কারাগারের রোজনামচা'য় (২০১৮)। ১৯৬৬ সলের ২ জুন প্রতিদিনের দিনলিপিতে একজন শেখ মুজিবুর রহমান ওই সময়ের অন্য নেতাদের সমঝোতা ও পলায়নপর মানসিকতা নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন লিখেছেন। তখন ন্যাপ নেতা মশিয়ুর রহমান আইয়ুব খানকে খুশি করতে কড়া কড়া বিবৃতি দিতেন, যা পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হতো। উল্লেখ্য, মশিয়ুর রহমান একাধিকবার ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ২ জুন শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন:

'এদের এই ধরনের কাজেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধরা পড়ে গেছে জনগণের কাছে। জনগণ জানে এই দলটির কিছু সংখ্যক নেতা কিভাবে কৌশলে আইয়ুব সরকারের অপকর্মকে সমর্থন করছে। আবার নিজেদের বিরোধী দল হিসেবে দাবি করে এরা জনগণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। এরা নিজেদের চীনপন্থী বলেও থাকেন। একজন এক দেশের নাগরিক কেমন করে অন্য দেশপন্থী, প্রগতিবাদী হয়? আবার জনগণের

স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চিৎকার করে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে যদি তদন্ত করা যায় তবে দেখা যাবে, মাসের মধ্যে কতবার এরা পিন্ডি করাচি যাওয়া-আসা করে, আর পারমিটের ব্যবসা বেনামিভাবে করে থাকে। এদের জাতই হলো সুবিধাবাদী। এর পূর্বে মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে।' (রহমান, ২০১৮: ৫৭)

একজন শেখ মুজিবুর রহমানের মাহাত্ম্য এখানেই। তিনি সুবিধাবাদের পক্ষে নয়, ছিলেন জনগণের অধিকারের পক্ষে। যার জন্য দিনের পর দিন জেল খেটেছেন। ফাঁসির দড়ি মাথার উপর নিয়ে গণমানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। আর অন্যরা করেছেন নানা পন্থি, নানা ভিনদেশি আদর্শভিত্তিক রাজনীতি। অন্য রাজনীতিবিদরা কখনোই মূলে পৌঁছতে পারেননি। তারা ছিলেন উপধারায়। মূলধারায় নন। আর শেখ মুজিব তাঁর দূরদর্শিতায় ধাপে ধাপে জনগণকে নিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতার পথে।

১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলায় শেখ মুজিব যখন কারাগারে, তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। ঘটা করে উন্নয়নের দশক পালন করেও আইয়ুব খান আন্দোলনের আগুন দমাতে পারেননি। 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর তীব্র আন্দোলন এবং মওলানা ভাসানীর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উনসত্তর সালে সংঘটিত হয় এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান। যে গণআন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হয়ে প্রধান রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। ছাত্রসমাজ শেখ মুজিবুর রহমানকে আখ্যায়িত করে 'বঙ্গবন্ধু' বা বাংলার বন্ধু হিসেবে। এরপর বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন শেখ মুজিব।

১৯৭০ সালের নির্বাচন শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। যে নির্বাচনে বাংলার আপামরসাধারণ শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মেনে নেন। এই নির্বাচনে শেখ মুজিব ছয় দফাভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সামনে নিয়ে আসেন। জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে জয়লাভ করে পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান চরিত্রে পরিণত হন শেখ মুজিব। তবে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হলে আবার শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজপথে নামতে হয়। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আইয়ুবের উত্তরসূরি ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে প্রবল গণআন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ওঠে ঢাকার রাজপথ, বাংলার পথে-প্রান্তরে। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাঠ করেন মুক্তি ও স্বাধীনতার অমর কবিতা। যে কবিতার ছন্দ আর ভবিষ্যৎ নির্দেশনায় ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে ওঠে। এক নেতা ও এক দেশের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয় পুরো জাতি।

এরপর রাজনৈতিক দৃশ্যপটে শুরু হয় নতুন নাটক। আলোচনার নামে কালক্ষেপণে ঢাকায় আসেন ইয়াহিয়া খান। আসেন চতুর ভুট্টোও। শুরু হয় আলোচনা। অন্যদিকে সাধারণ পোশাকে বেসামরিক বিমানে ঢাকায় আসতে থাকে পাকিস্তানি সেনারা। সমুদ্রপথে অস্ত্র। শেখ মুজিবুর রহমানও বসে ছিলেন না। আসন্ন সংঘাত আর চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনিও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ছাত্র-যুবনেতাদের দিচ্ছিলেন সংকটকালের নির্দেশনা। স্বাধীনতার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তুতি এবং তাতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহযোগিতার বিষয়ে অনেক আগে থেকেই কার্যকর যোগাযোগ রেখেছিলেন। যে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন অনেক আগেই। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব। ওই সময়ই স্বাধীনতার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। সেই সময়ই জরুরি যোগাযোগের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ হয়েছিল।

১৯৭১ সালে মার্চের উত্তাল সময়ে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সাহায্য ও সমর্থনের বিষয়ে নিশ্চিত হতে শেখ মুজিবুর রহমান অতি গোপনে ভারতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। যে ঘটনাপ্রবাহের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় মুসা সাদিকের লেখা '*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*' নিবন্ধে। নিবন্ধটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত '*বাঙলা ও বাঙালির ইতহাস, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব (২০১২)*'তে সংকলিত হয়েছে। তাতে মুসা সাদিক উল্লেখ করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ তাঁর বিশ্বস্ত দুই রাজনৈতিক সহচর রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি) ও নুরউদ্দীন আহমদ (আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ) দিল্লি পাঠিয়েছিলেন। যারা কলকাতা হয়ে লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে দিল্লির সাথে যোগাযোগ করেন। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের এই দুই প্রতিনিধির সঙ্গে প্রভাবশালী মন্ত্রী দুর্গা প্রসাদ ধরের বৈঠক হয়। এরপর আলোচনা হয় ভারতের নীতিনির্ধারক সাউথ ব্লকের অনেক শীর্ষ কর্তার সঙ্গে। রুহুল কুদ্দুস ও নুরউদ্দীন ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। কামনা করেন কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা। দিল্লির ডিফেন্স কলোনির এক বাড়িতে একদিন খুব ভোরে রুহুল কুদ্দুস ও নুরউদ্দীন পিএন হাকসারের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত বার্তা পান 'We wish doctors will take care of your health and to your A.L. family.' এই বার্তা নিয়ে ১৭ মার্চ খুলনা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন রুহুল কুদ্দুস ও নুরউদ্দীন। দ্রুত ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুকে তারা এই বার্তা জানান। যার ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেন শেখ মুজিবুর রহমান। উল্লেখ্য, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের আগে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক যুবনেতাকে কলকাতার একটি বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন। কলকাতা শহরতলির এই বাড়িটি ছিল চিত্তরঞ্জন সুতারের। যার মাধ্যমে ভারতীয় শীর্ষ নেতৃত্ব ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের। অনেক সমালোচক বলে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি! তাদের জন্য এই ঘটনাপ্রবাহ এক বড়ো জবাব। একজন শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বাধীনতা চাননি, তিনি এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে। যার আরও এক নজির ২৫ মার্চে ক্র্যাকডাউনের পর স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণার মাধ্যমে। যে ঘোষণায় শেখ মুজিব বলেছিলেন, '... দখলদার বাহিনীর একজন সেনা বাংলার মাটিতে থাকা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।' যার ভিত্তিতেই ৯ মাসেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙালি জাতি পেয়েছে একটি মানচিত্র একটি লাল-সবুজের পতাকা। যে পতাকার লাল-সবুজের বুননে মিশে আছে শেখ মুজিবুর রহমান। যে ভূখণ্ডের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর মমতা আর দেশের জন্য ভালোবাসা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব*। ঢাকা: প্রথমা।
২. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৭) *আওয়ামী লীগ: যুদ্ধ দিনের কথা ১৯৭১*। ঢাকা: প্রথমা।
৩. বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস (২০১২), চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পর্ব, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৪. মুরশিদ, গোলাম (২০১০), *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
৫. পেয়ারা, শামসুদ্দিন (২০১৯) *আমি সিরাজুল আলম খান*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়